সম্পৃক্ত। কাজেই এটাও একটা অবদান। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (আরেক অবদান এই যে) তিনি দুই দরিয়াকে (দৃশ্যত) মিলিত করেছেন, ফলে (বাহ্যত) সংযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়; কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক (প্রাকৃতিক) অন্তরাল, যা তারা (অর্থাৎ উভয় দরিয়া) অতিক্রম করতে পারে না। (লবণাক্ত পানি ও মিষ্ট পানির উপকারিতা অজানা নয়। দুই দরিয়া সংযুক্ত হওয়ার মধ্যে প্রমাণগত অবদানও আছে)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (দুই দরিয়া সম্পর্কিত এক অবদান এই যে) উভয় দরিয়া থেকে মোতি ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। (এগুলোর উপকারিতা ও অবদান হওয়া বর্ণনা সাপেক্ষ নয়)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (আরেক অবদান এই যে) তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন (ও মালিকানাধীন) সেই জাহাজসমূহ যেগুলো সমুদ্রে পর্বত সদৃশ ভাসমান (দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলোর উপকারিতাও দিবালোকের মত সুস্পষ্ট)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আর-রহমান মক্কায় অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরতুবী কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে মক্কায় অবতীর্ণ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিরমিযীতে হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন লোকের সামনে সমগ্র সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করেন। তাঁরা শুনে নিশ্চুপ থাকলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ আমি 'লায়লাতুল জিনে' (জিন-রজনীতে) জিনদের সামনে এই সূরা তিলাওয়াত করেছিলাম। প্রভাবান্বিত হওয়ার দিক দিয়ে তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম ছিল। কারণ, আমি যখনই সূরার

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا আয়াতটি তিলাওয়াত করতাম, তখনই তারা সমস্বরে বলে উঠত ঃ

ربنا لا نكذب بشيء من نعمك فلك الحمد অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কোন অবদানকেই অস্বীকার করব না। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা, 'জিন-রজনীর' ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। এই রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (সা) জিনদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছিলেন।

কুরতুবী এ ধরনের আরও কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সব হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরাটিকে 'রহমান' শব্দ দ্বারা শুরু করার তাৎপর্য এই যে, মক্কার কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার এই নাম সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই মুসলমানদের মুখে 'রহমান' নাম শুনে

তারা বলাবলি করত ঃ وَمَا الرَّحْمٰنُ রহমান আবার কি? তাদেরকে অবহিত করার জন্য এখানে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরের আয়াতে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই 'রহমান' শব্দটি ব্যবহার করে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কার্যকরী কারণ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও করুণা। নতুবা তাঁর দায়িত্বে কোন কাজ ওয়াজিব বা জরুরী নয় এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

এরপর সমগ্র সূরায় আল্লাহ্ তা'আলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবদানসমূহের অব্যাহত বর্ণনা রয়েছে। عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ বলে সর্ববৃহৎ অবদান দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কোরআন সর্ববৃহৎ অবদান। কেননা, এতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কল্যাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম কোরআনকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে পরকালীন উচ্চ মর্যাদা ও নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছেন, যা রাজা-বাদশাহ্‌রাও হাসিল করতে পারে না।

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী عَلَّمَ ক্রিয়াপদের দুটি কর্ম থাকে---এক. যা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং দুই. যাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আয়াতে প্রথম কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে ঃ অর্থাৎ কোরআন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ম অর্থাৎ কাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা) উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র সৃষ্ট জীব এতে দাখিল রয়েছে। এরূপও হতে পারে যে, কোরআন নাযিল করার লক্ষ্য সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পথপ্রদর্শন করা ও তাদেরকে নৈতিক চরিত্র ও সৎ কর্ম শিক্ষা দেওয়া। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই আয়াতে বিশেষ কোন কর্ম উল্লেখ করা হয়নি।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ---মানব সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় অবদান। স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে এটাই সর্বাগ্রে। কোরআন শিক্ষা দেওয়ার অবদানটি মানব সৃষ্টির পরেই হতে পারে। কিন্তু কোরআন পাক এই অবদান অগ্রে এবং মানব সৃষ্টি পরে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই হচ্ছে কোরআন শিক্ষা এবং কোরআন নির্দেশিত পথে চলা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে শুধু আমার ইবাদত করার জন্য করেছি। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র শিক্ষা ব্যতীত ইবাদত হতে পারে না।

কোরআন এই শিক্ষার উপায়। অতএব এই দিক দিয়ে কোরআন শিক্ষা মানব সৃষ্টির অগ্রে স্থান লাভ করেছে।

মানব সৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান মানবকে দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের ক্রমবিকাশ, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সাথে যেসব অবদান সম্পর্কযুক্ত; যেমন পানাহার, শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে মানব ও জন্তু-জানোয়ার নির্বিশেষে প্রাণীমাত্রই অংশীদার। কিন্তু যেসব অবদান বিশেষভাবে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রথমে কোরআন শিক্ষা ও পরে বর্ণনা শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া বর্ণনাশক্তির উপরই নির্ভরশীল।

এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা ও বাকপদ্ধতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ এবং এটা কার্যত عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا আয়াতের তফসীরও।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ——আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে নভোমণ্ডলীয় অবদানসমূহের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশ্ব-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এই দু'টি গ্রহের গতি ও কিরণ-রশ্মির সাথে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে।

حُسْبَانٍ শব্দটি কারও কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা حِسَابٌ শব্দের বহুবচন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়। حُسْبَانٍ শব্দটিকে حِسَابٌ-এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবের উপর সৌর ও চান্দ্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয়নি।

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ বলা হয়। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর নব নব আবিষ্কার প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান মানুষকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে। কিন্তু মানবাবিষ্কৃত বস্তু ও আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রত্যেকেরই চোখে পড়ে। মানবাবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে ভাঙ্গাগড়া এক অপরিহার্য বিষয়। মেশিন যতই মজবুত ও শক্ত হোক না কেন কিছুদিন পর তা মেরামত করা, কমপক্ষে কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা জরুরী হয়ে পড়ে।

মেরামত ও পরিচ্ছন্নকরণের সময়ে মেশিনটি অকেজো থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রবর্তিত এই বিশালকায় গ্রহগুলো কোন সময় মেরামতের মুখাপেক্ষী হয় না এবং এদের অব্যাহত গতিধারায় কোন পার্থক্যও হয় না।

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ —কাণ্ডবিহীন লতানো গাছকে نجم এবং কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে شجر বলা হয়। অর্থাৎ সর্বপ্রকার লতাপাতা ও বৃক্ষ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সিজদা করে। সিজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের লক্ষণ। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বৃক্ষ, লতাপাতা, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সেই কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এই সৃষ্টিজগত ও বাধ্যতা-মূলক আনুগত্যকেই আয়াতে 'সিজদা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।—(রূহুল-মা'আনী, মাযহারী)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ —رفع ও وضع দুটি বিপরীত শব্দ رفع শব্দের অর্থ সমুন্নত করা এবং وضع শব্দের অর্থ নীচে রাখা। আয়াতে প্রথমে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলা হয়েছে। স্থানগত উচ্চতা ও মর্যাদাগত উচ্চতা উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী আকাশের বিপরীত গণ্য হয়। সমগ্র কোরআনে এই বৈপরীত্য সহকারেই আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলার পর মীযান স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের বিপরীতে আসে না। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এখানেও প্রকৃতপক্ষে আকাশের বিপরীতে পৃথিবীকে আনা হয়েছে। তিন আয়াতের পর বলা হয়েছে وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ কাজেই আসলে আকাশ ও পৃথিবীর বৈপরীত্যই ফুটানো হয়েছে। কিন্তু বিশেষ রহস্যের কারণে উভয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি বিষয় অর্থাৎ মীযান স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় এতে রহস্য এই যে, মীযান স্থাপন এবং পরবর্তী তিন আয়াতে বর্ণিত মীযানকে যথাযথ ব্যবহার করার নির্দেশ, এতদুভয়ের সারমর্ম হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আত্মসাৎ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা। এখানে আকাশকে সমুন্নতকরণ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝখানে মীযানের কথা উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যও ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে শান্তিও ন্যায় এবং ইনসাফের মাধ্যমেই কায়েম থাকতে পারে। নতুবা অনর্থই অনর্থ হবে।

হযরত কাতাদাহ্, মুজাহিদ, সুদ্দী প্রমুখ 'মীযান' শব্দের তফসীর করেছেন ন্যায়-বিচার। কেননা, মীযান তথা দাঁড়িপাল্লার আসল লক্ষ্য ন্যায়বিচারই। তবে মীযানের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা। কোন কোন তফসীরবিদ মীযানকে এই অর্থেই নিয়েছেন। এর সারমর্মও পারস্পরিক লেনদেনে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। এখানে মীযানের

অর্থে এমন যন্ত্র দাখিল আছে, যদ্দ্বারা কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়; তা দুই পাল্লা-বিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাপযন্ত্র হোক।

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ—এই আয়াতে দাঁড়িপাল্লা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কমবেশী করে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত না হও।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ —অর্থাৎ ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজন কায়েম কর। قسط-এর শাব্দিক অর্থ ইনসাফ।

اَقِيْمُوا الْوَزْنَ—وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ বাক্যে যে বিষয়টি ধনাত্মক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে, এই বাক্যে তাই ঋণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ওজনে কম দেওয়া হারাম।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক প্রাণীকে انام বলা হয়।—(কামুস)

বায়যাভী বলেন ঃ যার আত্মা আছে, সেই —আয়াতে انام বলে বাহ্যত মানব ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যাদের আত্মা আছে, তাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত। এই সূরায় فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا বলে তাদেরকে বারবার সম্বোধনও করা হয়েছে।

فَاكِهَةٌ—ذَاتُ الْاَكْمَامِ এমন ফলমূলকে বলা হয়, যা আহারের পর স্বভাবত মুখের স্বাদ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়।

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ—اكمام শব্দটি كم-এর বহুবচন। এর অর্থ সেই বহিরাবরণ, যা খর্জুর ইত্যাদি ফলগুচ্ছের উপরে থাকে।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ—حب-এর অর্থ শস্য; যেমন গম, বুট, ধান, মাষ, মসুর ইত্যাদি। عصف সেই খোসাকে বলে, যার ভেতরে আল্লাহ্র কুদরতে মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা হয়। এই খোসার আবরণে মোড়কবিশিষ্ট হওয়ার

কারণে শস্যের দানা দূষিত আবহাওয়া ও পোকা-মাকড় ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যে রুটি, ডাল ইত্যাদি প্রত্যহ কয়েকবার আহার কর, এর এক একটি দানাকে সৃষ্টিকর্তা কিরূপ সুকৌশলে মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপর কিভাবে একে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আবরণ দ্বারা আবৃত করেছেন। এত কিছুর পরই সেই দানা তোমাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এর সাথে সম্ভবত আরও একটি অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর।

وَالرَّيْحَانُ—এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগন্ধি। ইবনে যায়েদ (র) আয়াতের এই অর্থই বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ থেকে নানা রকমের সুগন্ধি এবং সুগন্ধযুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। ريحان শব্দটি কোন কোন সময় নির্যাস ও রিযিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় خرجت أطلب ريحان الله অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র রিযিক অন্বেষণে বের হলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আয়াতে ريحان এর এ তফসীরই করেছেন।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ অবদান। আয়াতে জিন ও মানবকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আর-রহমানের একাধিক আয়াতে জিনদের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ—এখানে انسان বলে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট আদম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। صلصال-এর অর্থ পানি মিশ্রিত শুষ্ক মাটি। فخار—এর অর্থ পোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ—جان-এর অর্থ জিন জাতি। مارج-এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ—শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল পরিবর্তিত হয়। শীতকালে مشرق অর্থাৎ উদয়াচল এবং مغرب অর্থাৎ অস্তাচল

ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হয়। আয়াতে সম্বৎসরের এই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলকে مشرقين ও مغربين বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ—مرج মরজ এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে দেওয়া بحرين বলে মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নযীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নীচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্যই বলা হয়েছে ঃ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ—অর্থাৎ উভয় দরিয়া পরস্পরে মিলিত হয়; কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহ্‌র কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরকে মিশ্রিত হতে দেয় না।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ—لؤلؤ শব্দের অর্থ মোতি এবং مرجان এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মণিমুক্তা। এতে বৃক্ষের ন্যায় শাখা হয়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয়। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, মোতি ও মণিমুক্তা লোনা সমুদ্র থেকে বের হয়—মিঠা সমুদ্র নয়। আয়াতে উভয় প্রকার সমুদ্র থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মিঠা পানির সমুদ্র প্রবহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা পানির সমুদ্র প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে।

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ—جوارى শব্দটি جارية-এর বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা, জাহাজ। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। منشآت শব্দটি نشأ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উঁচু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বোঝানো হয়েছে, যা পতাকার ন্যায় উঁচু হয়। আয়াতে নৌকার নির্মাণ-কৌশল ও পানির উপর বিচরণ করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَٰلِ وَالْإِ

كَرَامِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۭ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝
سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يٰمَعْشَرَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ
فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ
فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ۝ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۝
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا
الْمُجْرِمُوْنَ ۝ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(২৬) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। (২৭) একমাত্র আপনার মহিমময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া। (২৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোন-না-কোন কাজে রত আছেন। (৩০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩১) হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (৩২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার

করবে? (৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। (৩৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৭) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন হয়ে যাবে রক্তিমাভ, লাল চামড়ার ন্যায়। (৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৯) সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন। (৪০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অতএব তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে। (৪২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত। (৪৪) তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (৪৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ পর্যন্ত যেসব অবদানের কথা তোমরা শুনলে, তোমাদের উচিত তওহীদ ও ইবাদতের মাধ্যমে এগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং কুফর ও গোনাহের মাধ্যমে অকৃতজ্ঞতা না করা। কেননা, এ জগত ধ্বংস হওয়ার পর আরেকটি জগৎ আসবে। সেখানে ঈমান ও কুফরের কারণে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে তাই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই (অর্থাৎ জিন ও মানব) ধ্বংস হয়ে যাবে এবং (একমাত্র) আপনার পালনকর্তার মহিমময় ও মহানুভব সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। (উদ্দেশ্য জিন ও মানবকে হুঁশিয়ার করা। তারা ভূপৃষ্ঠে বসবাস করে। তাই বিশেষভাবে ভূপৃষ্ঠের সবকিছু ধ্বংস হবে বলা হয়েছে। এতে জরুরী হয় না যে, অন্য কোন বস্তু ধ্বংস হবে না। এখানে আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। মহিমময় ও মহানুভব। প্রথমটি সত্তাগত ও দ্বিতীয়টি আপেক্ষিক। এর সারমর্ম এই যে, অনেক মহিমান্বিত ব্যক্তি অপরের অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার মহামহিম হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেন। পৃথিবী ধ্বংস হওয়া ও এরপর প্রতিদান ও শাস্তিদানের সংবাদ দেওয়া মানুষকে ঈমানরূপ ধন দান করার নামান্তর। তাই এটা একটা বড় অবদান। সেমতে বলা হয়েছে ঃ) অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার। (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (তিনি এমন মহিমময় যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁরই কাছে (নিজ নিজ প্রয়োজন) প্রার্থনা করে। (ভূমণ্ডলে বসবাসকারীদের প্রয়োজন বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। নভোমণ্ডলে বসবাসকারীরা পানাহার না করলেও দয়া ও অনুকম্পার মুখাপেক্ষী। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার মহানুভবতা প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তিনি সর্বদাই, কোন-না-কোন কাজে রত থাকেন। (এর অর্থ এরূপ নয় যে, কাজ করা তাঁর সত্তার জন্য অপরিহার্য। বরং অর্থ এই যে, বিশ্বচরাচরে যত কাজ হচ্ছে, সবই তাঁরই কাজ। তাঁর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মহিমময় হওয়া সত্ত্বেও এরূপ অনুগ্রহ

ও কৃপা করাও একটি মহান অবদান)। অতএব হে মানব ও জিন! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অতঃপর আবার পৃথিবী ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তোমরা মনে করো না যে, ধ্বংসের পর শাস্তি ও প্রতিদান হবে না; বরং আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করব এবং শাস্তি ও প্রতিদান দেব। বলা হচ্ছে ঃ) হে মানব ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের (হিসাব-নিকাশের) জন্য কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (অর্থাৎ হিসাব কিতাব নেব। রূপক ও আতিশয্যের অর্থে একেই কর্মমুক্ত হওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আতিশয্য এভাবে বোঝা যায় যে, মানুষ সব কাজ থেকে মুক্ত হয়ে কোন কাজে হাত দিলে একে পূর্ণ মনোনিবেশ বলে গণ্য করা হয়। মানুষের বুঝবার জন্য একথা বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার শান এই যে, তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাঁধা হয়ে যায় না। তিনি যে কাজে মনোবিবেশ করেন পূর্ণরূপেই মনোনিবেশ করেন। আল্লাহ্র কাজে অসম্পূর্ণ মনোনিবেশের সম্ভাবনা নেই। এই হিসাব নিকাশের সংবাদ দেওয়াও একটি মহান অবদান। তাই বলা হচ্ছে ঃ) হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (হিসাব-নিকাশের সময় কারও পলায়ন করারও সম্ভাবনা নেই। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ) হে জিন ও মানবকুল! নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করে বাইরে চলে যাওয়া যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে (আমিও দেখি,) তোমরা চলে যাও, (কিন্তু) শক্তি ব্যতীত তোমরা চলে যেতে পারবে না। (শক্তি তোমাদের নেই। কাজেই চলে যাওয়াও সম্ভবপর নয়। কিয়ামতেও তদ্রূপ হবে। বরং সেখানে অক্ষমতা আরও বেশী হবে। মোটকথা, পলায়ন করার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়টি বলে দেওয়াও হিদায়তের কারণ এবং একটি মহান অবদান।) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (উপরে যেমন হিসাব-নিকাশের সময় তাদের অক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি অতঃপর আযাবের সময় তাদের অক্ষমতা উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ হে জিন ও মানব অপরাধীরা!) তোমাদের প্রতি (কিয়ামতের দিন) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং ধূম্রকুঞ্জ ছাড়া হবে। অতঃপর তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না। একথা বলাও হিদায়তের উপায় হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (যখন হিসাব-নিকাশ নেওয়া ও এতদসঙ্গে তোমাদের অক্ষমতার কথা জানা গেল, তখন কিয়ামতের দিন প্রতিদান ও শাস্তির বাস্তবতা প্রমাণিত হয়ে গেল। সুতরাং) যখন (কিয়ামত আসবে এবং) আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন হয়ে যাবে রক্তিমাভ, লাল চামড়ার মত। (ক্রোধের সময় চেহারা রক্তিমাভ হয়ে যায়। ক্রোধের আলামত হিসাবেই সম্ভবত এই রং হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি মহান অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? অতঃপর বলা হচ্ছে যে, অপরাধী ও অপরাধের পরিচয় আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে, কিন্তু ফেরেশতারা অপরাধীদেরকে কিভাবে চিনবে? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে। (কারণ তাদের

চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু নীলাভ হবে। যেমন অন্য আয়াতে আছে تَسْوَدُّ وُجُوهٌ এবং نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا অতঃপর তাদের কেশাগ্র ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে। এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অর্থাৎ আমল অনুযায়ী কারও কেশাগ্র এবং কারও পা ধরা হবে অথবা কখনও কেশাগ্র এবং কখনও পা ধরা হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? এটাই সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলতো। তারা জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (অর্থাৎ কখনও অগ্নির আযাব এবং কখনও ফুটন্ত পানির আযাব হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

এর অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত জিন ও মানব আছে, তারা সবাই ধ্বংসশীল। এই সূরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

وَجْهُ رَبِّكَ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে وَجْهُ বলে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং শব্দের رَبِّكَ সম্বোধন সর্বনাম দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। এটা সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি বিশেষ সম্মান। প্রশংসার স্থলে কোথাও তাঁকে عَبْدُهُ এবং কোথাও رَبِّكَ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা।

ধ্বংসশীল হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনও সত্তাগতভাবে ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। আরেক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

কোন তফসীরবিদ وَجْهُ رَبِّكَ —এর তফসীর এরূপ করেছেন যে, সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বস্তুই স্থায়ী, যা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আছে। এতে শামিল আছে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং মানুষের সেসব কর্ম ও অবস্থা, যা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সারমর্ম এই যে, মানব জিন ও ফেরেশতা যে কাজ আল্লাহ্র জন্য করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না। --(মাযহারী, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ —অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কষ্ট অথবা ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধ্বংস হবে না।

ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ —অর্থাৎ সেই পালনকর্তা মহিমামণ্ডিত এবং মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমময় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত নন যে, অন্যের বিশেষত দরিদ্রের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না; বরং তিনি অকল্পনীয় সম্মান ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবেরও সম্মান বর্ধন করেন। তাদেরকে অস্তিত্ব দানের পর নানাবিধ অবদান দ্বারা ভূষিত করেন এবং তাদের প্রার্থনা ও দোয়া শুনেন। পরবর্তী আয়াতে এই দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ —বাক্যটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে যে দোয়াই করা হয়, কবুল হয়। তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ الظوا بيا ذا الجلال وا لا كرام —অর্থাৎ তোমরা "ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" বলে দোয়া করো। (কারণ, এটা কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক)।---মাযহারী

يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ---অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তার কাছেই প্রয়োজনাদি যাচ্ঞা করেন। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের রিযিক, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুখ-শান্তি, পরকালে ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত প্রার্থনা করে এবং আকাশের অধিবাসীরা যদিও পানাহার করে না; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার তারাও মুখাপেক্ষী। كل يوم

শব্দটি يسئل বাক্যের ظرف—অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের এই যাচ্ঞা ও প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। এর সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্ট বস্তু বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কাছে নিজেদের অভাব-অনটন সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীস্থ ও আকাশস্থ সমগ্র সৃষ্ট জীব ও তাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভাব -অনটন আছে। তাও আবার প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি পলে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো এই মহিমময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে শুনতে পারে এবং পূর্ণ করতে পারে? তাই كُلَّ يَوْمٍ

এর সাথে هُوَ فِي شَأْنٍ ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বদা ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ শান ও অবস্থা থাকে। তিনি কাউকে জীবনদান করেন, কারও মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন। কাউকে লাঞ্ছিত করেন কোন সুস্থকে অসুস্থ, কোন অসুস্থকে সুস্থ করেন। কোন বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, কোন ব্যথিত ও ক্রন্দনকারীর মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন। কারও পাপ মার্জনা করে তাকে জান্নাতের যোগ্য করে দেন। কোন জাতিকে সমুন্নত ও ক্ষমতায় আসীন করে দেন এবং কোন জাতিকে অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত করে দেন। মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ শান থাকে।

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ —ثقلان শব্দটি ثقل এর দ্বি-বচন। যে বস্তুর ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষায় তাকে ثقل বলা হয়। এখানে মানব ও জিন জাতিদ্বয় বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ انى تارك فيكم الثقلين অর্থাৎ আমি দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি। এগুলো তোমাদের জন্য সৎপথের দিশারী হয়ে থাকবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে كتاب الله বলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে كتاب الله و سنتى বলে উল্লিখিত বিষয় দুটি বর্ণিত হচ্ছে। উভয়ের সারমর্ম এক। কেননা, عترتى বলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশগত ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সন্তান-সন্ততি বোঝানো হয়েছে। কাজেই সাহাবায়ে কিরামও এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর দুটি বিষয় মুসলমানদের হিদায়াত ও সংশোধনের উপায় হবে—একটি আল্লাহ্র কিতাব কোরআন ও অপরটি সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের কর্মপদ্ধতি। যে হাদীসে 'সুন্নত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার সারমর্ম হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এর শিক্ষা, যা সাহাবায়ে-কিরামের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছে।

মোটকথা, এই হাদীসে ثقلين বলে দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থের দিকে দিয়েই ثقلان

বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্হ। سنفرغ শব্দটি فراغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কর্মমুক্ত হওয়া। অভিধানে فراغ বিপরীত শব্দ হচ্ছে شغل অর্থাৎ কর্মব্যস্ততা فراغ শব্দ থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়---এক. পূর্বে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা এবং দুই. এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় সৃষ্ট জীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। মানুষ কোন সময় এক কাজে ব্যস্ত থাকে এরপর তা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উভয় বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাধা হয় না এবং তিনি মানুষের ন্যায় কাজ থেকে অবসর লাভ করেন না।

তাই আয়াতে سَنَفْرُغُ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী একথা বলা হয়েছে। কোন কাজের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বলা হয়ঃ আমি এই কাজের জন্য অবসর লাভ করেছি; অর্থাৎ এখন এ কাজেই পুরাপুরি মনোনিবেশ করব। কোন কাজে পূর্ণ মনোযোগ ব্যয় করাকে বাক পদ্ধতিতে এভাবে প্রকাশ করা হয়ঃ তার তো এছাড়া কোন কাজ নেই।

এর আগের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীব আল্লাহ্র কাছে তাদের অভাব-অনটন পেশ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্বদাই এক বিশেষ শানে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আবেদন ও আবেদন মঞ্জুর করা সম্পর্কিত সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন কাজ কেবল একটি থাকবে এবং শানও একটি হবে; অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও ইনসাফ সহকারে ফয়সালা প্রদান।---(রূহুল মা'আনী)

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ -

পূর্ববর্তী আয়াতে জিন ও মানবকে ثقلين শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন একটিই কাজ হবে; অর্থাৎ সকল জিন ও মানবের কাজকর্ম পরীক্ষা হবে এবং প্রতিটি কাজের প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অথবা কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। এই আয়াতে ثقلان এর পরিবর্তে জিন ও মানবের প্রকাশ্য নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিনকে অগ্রে রাখা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে বিরাট শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কাজের শক্তি মানুষের চাইতে বেশী দিয়েছেন। তাই জিনকে অগ্রে

উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুল-মওতের কবল থেকে গা বাঁচিয়ে যাবে অথবা হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এস, শক্তি পরীক্ষা করে দেখ। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তবে অতিক্রম করে দেখাও। এটা সহজ কাজ নয়। এর জন্য অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন ও মানব কারও এরূপ শক্তি নেই। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা লক্ষ্য।

আয়াতে যদি মৃত্যু থেকে পলায়ন বোঝানো হয়ে থাকে, তবে এই দুনিয়াই এর দৃষ্টান্ত। এখানে ভূপৃষ্ঠ থকে আকাশ পর্যন্ত সীমা ডিঙ্গিয়ে বাইরে চলে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। এসব সীমা ডিঙানোর উল্লেখও মানুষের ধারণা অনুযায়ী করা হয়েছে। নতুবা যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ আকাশের সীমানা ডিঙ্গিয়ে বাইরে চলে গেল, তবে তাও আল্লাহ্‌র কুদরতের সীমানার বাইরে হবে না। পক্ষান্তরে যদি আয়াতে একথা বোঝানো হয়ে থাকে যে, হাশরের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহি থেকে পলায়ন অসম্ভব, তবে এর কার্যত উপায় কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কিয়ামতের দিনে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে সব ফেরেশতা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এসে যাবে এবং মানব ও ও জিনকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে নেবে। কিয়ামতের ভয়াবহ কাণ্ড দেখে মানব ও জিন বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করবে। অতঃপর চতুর্দিকে ফেরেশতাদের অবরোধ দেখে তারা স্বস্থানে ফিরে আসবে।---(রূহুল মা'আনী)

কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেটের সাহায্যে মহাশূন্য যাত্রার কোন সম্পর্ক এই আয়াতের সাথে নেই ঃ বর্তমান যুগে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানা অতিক্রম করার এবং রকেটে চড়ে মহাশূন্যে পৌঁছার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এসব পরীক্ষা আকাশের সীমানার বাইরে নয়; বরং আকাশের ছাদের অনেক নীচে হচ্ছে। এর সাথে আকাশের সীমানা অতিক্রম করার কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানীরা তো আকাশের সীমানার কাছেও পৌঁছতে পারে না ---বাইরে যাওয়া দূরের কথা। কোন কোন সরলপ্রাণ মানুষ মহাশূন্য যাত্রার সম্ভাব্যতা ও বৈধতার পক্ষে এই আয়াতকেই পেশ করতে থাকে---এটা কোরআন সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ---হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ ধূম্রবিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে شُوَاظٌ এবং অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জকে نُحَاسٌ বলা হয়। এই আয়াতেও জিন ও মানবকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ ছাড়ার কথা বর্ণনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামে অপরাধীদেরকে দুই প্রকার আযাব দেওয়া হবে। কোথাও ধূম্রবিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে এবং কোথাও অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জ হবে। কোন কোন

তফসীরবিদ এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট ধরে নিয়ে এরূপ অর্থ করেছেন যে, হে জিন ও মানব! আকাশের সীমানা অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের নেই। তোমরা যদি এরূপ করতেও চাও, তাবে যেদিকেই পালাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।---(ইবনে কাসীর)

لَا تَنْتَصِرَانِ---এটা انصار থেকে উদ্ভূত। অর্থ কাউকে সাহায্য করে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য জিন ও মানবের মধ্য থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ---অর্থাৎ সেদিন কোন মানব অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ করেছ কি না? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদি জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ কেন করলে? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই তফসীর করেছেন। মুজাহিদ বলেনঃ অপরাধীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ্ করেছ কিনা? এর প্রয়োজনই হবে না। কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ এই চিহ্ন দেখে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। পরবর্তী يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ আয়াতে এই বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে। উপরোক্ত উভয় তফসীরের সারমর্ম এই যে, হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ফয়সালার পর এই ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না। তারা আলামত দ্বারা চিহ্নিত হয়েই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেনঃ এটা তখনকার অবস্থা যখন একবার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাবে এবং অপরাধীরা অস্বীকার করবে ও কসম খাবে। তখন তাদের মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই তিনটি তফসীর কাছাকাছি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

سِيْمَا---يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ

শব্দের অর্থ আলামত চিহ্ন। হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ সেদিন অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ঐ চক্ষু নীলাভ হবে। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ন হবে। এই আলামতের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে।

نَاصِيَةٌ শব্দটি نَوَاصِي এর বহুবচন। অর্থ কপালের চুল। কেশাগ্র ও পা ধরার এক অর্থ এই যে, কারও কেশাগ্র ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা এক সময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۝٤٦ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٤٧
ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۝٤٨ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٤٩ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ
تَجْرِيٰنِ ۝٥٠ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٥١ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ
فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۝٥٢ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٥٣ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍ
بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ۭ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝٥٤ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ۝٥٥ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا
جَآنٌّ ۝٥٦ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٥٧ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۝٥٨
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٥٩ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝٦٠
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦١ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۝٦٢
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦٣ مُدْهَآمَّتٰنِ ۝٦٤ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦٥ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۝٦٦ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ۝٦٧ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۝٦٨ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ۝٦٩ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۝٧٠ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧١
حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ۝٧٢ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧٣
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝٧٤ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧٥

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

(৪৬) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। (৪৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। (৪৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫০) উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবণ। (৫১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। (৫৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে। (৫৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৬) তথায় থাকবে আনতনয়না রমণিগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। (৫৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৮) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণিগণ। (৫৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬০) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (৬১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬২) এই দুটি ছাড়া আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৪) কালোমত ঘন সবুজ। (৬৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৬) তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ। (৬৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৮) তথায় আছে ফল-মূল, খর্জুর ও আনার। (৬৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণিগণ। (৭১) অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭২) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। (৭৩) অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৪) কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। (৭৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৮) কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমময় ও মহানুভব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য আয়াতসমূহে وَلِمَنْ خَافَ থেকে দুটি উদ্যানের এবং وَمِنْ دُوْنِهِمَا থেকে দুটি উদ্যানের উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয় বিশেষ নৈকট্য-শীলদের জন্য এবং শেষোক্ত উদ্যানদ্বয় সাধারণ মু'মিনদের জন্য। এর প্রমাণ পরে বর্ণিত হবে। এখানে শুধু তফসীর লেখা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল। এখান থেকে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হচ্ছে। জান্নাতীগণ দুই ভাগে বিভক্ত-বিশেষ শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণী। অতএব) যে, ব্যক্তি (বিশেষ শ্রেণীর এবং) তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার (সর্বদা) ভয় রাখে। (এবং ভয় রেখে কুপ্রবৃত্তি ও পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, এটা বিশেষ শ্রেণীরই অবস্থা। কারণ সাধারণ শ্রেণী মাঝে মাঝে ভয় রাখে এবং মাঝে মাঝে পাপকর্মও করে ফেলে; যদিও তওবা করে নেয়। মোটকথা যে ব্যক্তি এরূপ আল্লাহ্‌ভীরু) তার জন্য (জান্নাতে) দুটি উদ্যান রয়েছে। (অর্থাৎ প্রতিজনের জন্য দুটি উদ্যান। এই একাধিক উদ্যান থাকার রহস্য সম্ভবত তাদের সম্মান ও বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করা; যেমন দুনিয়াতে ধনীদের কাছে অধিকাংশ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ একাধিক হয়ে থাকে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট হবে। (এতে ছায়ার ঘনত্ব ও ফল-ফুলের প্রাচুর্যের দিকে ইঙ্গিত আছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে থাকবে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফলের দুই প্রকার হবে। (এতে অধিক স্বাদ গ্রহণের সুযোগ আছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (নিয়ম এই যে, উপরের কাপড় আস্তরের তুলনায় উৎকৃষ্ট হয়। আস্তরই যখন রেশমের, তখন উপরের কাপড় কেমন হবে অনুমান করা যায়)। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। (ফলে দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট, শায়িত সর্বাবস্থায় অনায়াসে ফল হাতে আসবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তথায় (অর্থাৎ উদ্যানের প্রাসাদসমূহে) আনতনয়না রমণিগণ (অর্থাৎ হুরগণ) থাকবে, যাদেরকে তাদের (অর্থাৎ এই জান্নাতীদের) পূর্বে কোন জিন ও মানব ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অব্যবহৃতা হবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার

করবে? (তাদের রূপলাবন্য এত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হবে) যেন তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার। (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অতঃপর উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য বলা হচ্ছে ঃ) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (তারা চূড়ান্ত আনুগত্য করেছে, তাই পুরস্কারও চূড়ান্ত পেয়েছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (এ হচ্ছে বিশেষ শ্রেণীর জান্নাতীদের উদ্যানের অবস্থা। এখন সাধারণ মু'মিনদের উদ্যান বর্ণিত হচ্ছে ঃ) এই দুটি উদ্যান ছাড়া নিম্ন-স্তরের আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (প্রত্যেক সাধারণ মু'মিন দু দুটি করে পাবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যান ঘন সবুজ হবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে থাকবে উত্তাল দুই প্রস্রবণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (উত্তাল হওয়া প্রস্রবণের স্বভাব। উপরের প্রস্রবণেরও একই অবস্থা। সেখানে অতিরিক্ত نَضَّاخَتَانِ বহমানও বলা হয়েছে। সুতরাং এটা ইঙ্গিত যে, এই প্রস্রবণ বহমান হওয়ার ব্যাপারে প্রথমোক্ত প্রস্রবণ-দ্বয়ের চাইতে কম এবং এই উদ্যানদ্বয় সেই উদ্যানদ্বয়ের চাইতে নিম্নস্তরের)। উভয় উদ্যানে আছে ফল-মূল খর্জুর ও আনার। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? সেখানে (অর্থাৎ সেখানকার প্রাসাদসমূহে) থাকবে সুশীলা, সুন্দরী রমণিগণ। (অর্থাৎ হুরগণ) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তাঁবুতে সংরক্ষিতা লাবণ্যময়ী রমণিগণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? এই জান্নাতী-দের পূর্বে কোন জিন ও মানব তাদেরকে ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ অব্যবহাতা হবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (সেখানে রমণিগণকে প্রবাল ও পদ্মরাগের সাথে তুলনা করা এবং এখানে শুধু حِسَانٌ সুন্দরী বলা এ থেকেও বোঝা যায় যে, প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয় শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের চাইতে শ্রেষ্ঠ) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এই উদ্যানদ্বয়ের বিছানা প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে। কেননা, সেখানে রেশমের ও আস্তরবিশিষ্ট হওয়ার কথা আছে, এখানে নেই। অতঃপর পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণিত হয়েছে। এতে সূরা

আর-রহমানে বিশদভাবে বর্ণিত বিষয়সমূহের সমর্থন ও তাকীদ আছে)। কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব। (নাম বলে গুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা সত্তা থেকে ভিন্ন নয়। কাজেই এই বাক্যের সারমর্ম হচ্ছে সত্তা ও গুণাবলী দ্বারা প্রশংসা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনদের উত্তম প্রতিদান ও অবদান বর্ণনা করা হচ্ছে। তন্মধ্যে জান্নাতীদের প্রথমোক্ত দুই উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দুই উদ্যান ও তাতে সরবরাহকৃত অবদানসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত দুই উদ্যান কাদের জন্য, একথা وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে, যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ভয়ে ভীত থাকে। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায় না। বলা বাহুল্য, এ ধরনের লোক বিশেষ নৈকট্যশীলগণই হতে পারে।

শেষোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী কারা হবে, এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই দুই উদ্যান প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে। وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই উদ্যানদ্বয়ের অধিকারী হবে সাধারণ মু'মিনগণ, যারা মর্যাদায় নৈকট্যশীলদের চেয়ে কম।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ আরও অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরোক্ত তফসীরই অগ্রগণ্য মনে হয়। কেননা দুররে মনসূরের বরাত দিয়ে বয়ানুল কোরআনে এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ এবং وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

جنتان من ذهب للمقربين و جنتان من ورق لاصحاب اليمين

অর্থাৎ স্বর্ণনির্মিত দুই উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্য এবং রৌপ্য নির্মিত দুই উদ্যান সাধারণ সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনদের জন্য। এছাড়া 'দুররে মনসূরে' হযরত বারা ইবনে আযেব থেকে

বর্ণিত আছে ঃ العينان التى تجريان خيرمن النضا ختان অর্থাৎ প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের দুই প্রস্রবণ, যাদের সম্পর্কে تجريان তথা বহমান বলা হয়েছে, শেষোক্ত দুই উদ্যানের প্রস্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে نضاختان তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা প্রস্রবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত।

এ হচ্ছে প্রস্রবণ চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যেগুলো জান্নাতীগণ লাভ করবে। এখন আয়াতের ভাষা ও অর্থ দেখুন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ ----অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে مقام رب বলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হিসাবের জন্য উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতির ভয় রাখার অর্থ এই যে, জনসমক্ষে ও নির্জনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় এই ধ্যান থাকা যে, আমাকে একদিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং ক্রিয়া-কর্মের হিসাব দিতে হবে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তির সদাসর্বদা এরূপ ধ্যান থাকবে, সে পাপ-কর্মের কাছে যাবে না।

কুরতুবী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ مقام رب এর এরূপ তফসীরও করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ্য কর্ম দেখাশুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তার দৃষ্টির সামনে। আল্লাহ্ তা'আলার এই ধ্যানও মানুষকে পাপ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ----এটা প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের বিশেষণ। অর্থাৎ উদ্যান-দ্বয় ঘন শাখাপল্লব বিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেশী হবে। পরবর্তীতে উল্লিখিত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের অভাব বোঝা যায়।

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ----প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বিশেষণে مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বর্ণনায় শুধু فَاكِهَةٌ বলা হয়েছে। زَوْجَانِ--এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে---শুষ্ক ও আর্দ্র। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদ-যুক্ত।---(মাযহারী)

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ----طمث শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত

হয়। এর এক অর্থ হায়েযের রক্ত। যে নারীর হায়েয হয়, তাকে طامث বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও طمث বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. যেসব রমণী মানুষের জন্য নির্ধারিত, তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং যেসব রমণী জিনদের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জিন স্পর্শ করেনি। দুই. দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে, জান্নাতে এরূপ কোন আশংকা নেই।

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ—নৈকট্যশীলদের উদ্যানদ্বয়ের কিছু বিবরণ পেশ করার পর ইরশাদ হয়েছে যে, সৎ কর্মের প্রতিদান উত্তম পুরস্কারই হতে পারে. এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। তারা সর্বদা সৎ কর্ম পালন করেছে, কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল, যা দেওয়া হয়েছে।

مُدْهَامَّتَانِ—ঘন সবুজের কারণে যে কাল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে ادهام বলা হয়। অর্থাৎ এই উদ্যানদ্বয়ের ঘন সবুজতা এদের কালোমত হওয়ার কারণ হবে। প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি বটে, কিন্তু وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ—বিশেষণে এই বিশেষণও শামিল আছে।

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ—خيرات—এর অর্থ চারিত্রিক দিক দিয়ে সুশীলা এবং حسان—এর অর্থ দেহাবয়বের দিক দিয়ে সুন্দরী। উভয় উদ্যানের রমণিগণ সমভাবে এই বিশেষণে বিশেষিতা হবে।

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ—رفرف—এর অর্থ সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্র।—(কামূস) এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য বিলাসসামগ্রী তৈরী করা হয়। সিহাহ্ গ্রন্থে আছে, এর উপর বৃক্ষ ও ফুলের কারুকার্য করা হয়। عبقری এর অর্থ সুশ্রী ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র।

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ—সূরা আর-রহমানে বেশীর ভাগ আল্লাহ্ তা'আলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে সার-সংক্ষেপ হিসাবে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা অনন্য। তাঁর নামও খুব পুণ্যময়। তাঁর নামের সাথেই এসব অবদান কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত আছে।

سورة الواقعة

সূরা ওয়াকিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৯৬, রুকূ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣
اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۝٤ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَآءً
مُّنْۢبَثًّا ۝٦ وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝٧ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ
اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨ وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝٩
وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝١٠ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٢
ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٤ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝١٥
مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝١٦ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۝١٧
بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝١٨ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا
وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۝١٩ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۝٢٠ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا
يَشْتَهُوْنَ ۝٢١ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۝٢٢ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۝٢٣ جَزَآءًۢ
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢٤ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۝٢٥ اِلَّا
قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ۝٢٦ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۝٢٧ فِىْ
سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۝٢٨ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۝٢٩ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۝٣٠ وَّمَآءٍ
مَّسْكُوْبٍ ۝٣١ وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۝٣٢ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۝٣٣

وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۝ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۝ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۝
عُرُبًا اَتْرَابًا ۝ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَثُلَّةٌ
مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝ وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۝
فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۝ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۝
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۝ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى
الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝ اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّ
الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ
مَّعْلُوْمٍ ۝ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ
شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝ فَشٰرِبُوْنَ
عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝ هٰذَا
نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, (২) যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই। (৩) এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে। (৪) যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী (৫) এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে (৬) অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা (৭) এবং তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৮) যারা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তারা (৯) এবং যারা বাম দিকে, কত হতভাগা তারা! (১০) অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই (১১) তারাই নৈকট্যশীল, (১২) অবদানের উদ্যানসমূহে, (১৩) তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (১৪) এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, (১৫) স্বর্ণখচিত সিংহাসনে (১৬) তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। (১৭) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চিরকিশোরেরা (১৮) পানপাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, (১৯) যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। (২০) আর তাদের পছন্দমত ফল-মূল নিয়ে (২১) এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। (২২) তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ (২৩) আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায় (২৪) তারা যা

কিছু করত, তার পুরস্কারস্বরূপ। (২৫) তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না (২৬) কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম। (২৭) যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান! (২৮) তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে (২৯) এবং কাঁদি কাঁদি কলায়, (৩০) এবং দীর্ঘ ছায়ায় (৩১) এবং প্রবাহিত পানিতে, (৩২) ও প্রচুর ফল-মূলে, (৩৩) যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়, (৩৪) আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। (৩৫) আমি জান্নাতী রমণিগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। (৩৬) অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, (৩৭) কামিনী, সমবয়স্ক (৩৮) ডান দিকের লোকদের জন্য। (৩৯) তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (৪০) এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (৪১) বাম পার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা! (৪২) তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে, (৪৩) এবং ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায় (৪৪) যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। (৪৫) তারা ইতিপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল। (৪৬) তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপ-কর্মে ডুবে থাকত। (৪৭) তারা বলত ঃ আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব? (৪৮) এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? (৪৯) বলুন ঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, (৫০) সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। (৫১) অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারিগণ! (৫২) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কূম বৃক্ষ থেকে, (৫৩) অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে, (৫৪) অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি। (৫৫) পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। (৫৬) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন কিয়ামত ঘটবে, যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই; (বরং তা ঘটা সম্পূর্ণ সত্য)। এটা (কতককে) নীচু করে দেবে এবং (কতককে) সমুন্নত করে দেবে। (অর্থাৎ সেদিন কাফিরদের লাঞ্ছনা এবং মু'মিনদের ইজ্জত প্রকাশ পাবে)। যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, অতঃপর তা হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা। তোমরা সবাই (যারা তখন বিদ্যমান থাকবে অথবা পূর্বে মারা গেছে, অথবা ভবিষ্যতে জন্মলাভ করবে) তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে [নৈকট্যশীল মু'মিন, সাধারণ মু'মিন ও কাফির। সূরা আর-রহমানেও এই তিন শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী আয়াত-সমূহে নৈকট্যশীলদেরকে سابقون ও مقربون এবং সাধারণ মু'মিনকে اصحاب اليمين (ডান পার্শ্বস্থ লোক) ও কাফিরদেরকে اصحاب الشمال (বাম পার্শ্বস্থ লোক) বলা হয়েছে। আয়াত اذا وقعت থেকে ثلة পর্যন্ত কোন কোন ঘটনা প্রথম শিঙ্গা ফুঁকার সময়কার; যেমন رجت ও بست এবং কোন কোন ঘটনা

দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুঁকার সময়কার; যেমন كُنْتُمْ أَزْوَاجًا এবং خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ অতঃপর

প্রকারত্রয়ের বিধান আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত-ভাবে। তন্মধ্যে এক প্রকার এই যে] যারা ডানপার্শ্বের লোক, তারা কত ভাগ্যবান! (যাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তাদেরকে 'ডান পার্শ্বের লোক' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই গুণটি নৈকট্যশীলদের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু এখানে কেবল এই গুণটি উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে অতিরিক্ত বিশেষ নৈকট্যের গুণ পাওয়া যায় না। ফলে এর উদ্দিষ্ট অর্থ হয়ে গেছে সাধারণ মু'মিনগণ। এতে সংক্ষেপে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা ভাগ্য-বান। অতঃপর فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার এই যে) যারা বাম পার্শ্বের লোক, কত হতভাগা তারা! (যাদের বাম হাতে আমল-নামা দেওয়া হবে, তাদেরকে 'বাম পার্শ্বের লোক' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ কাফির সম্প্রদায়। এতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তারা হতভাগা। অতঃপর فِي سَمُومٍ

আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তৃতীয় প্রকার এই যে) যারা সর্বোচ্চ স্তরের, তারা তো সর্বোচ্চ স্তরেরই। তারাই (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যশীল। (এতে সব সর্বোচ্চ স্তরের বান্দা দাখিল আছেন---নবী, ওলী, সিদ্দীক ও কামিল মু'মিন। এতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তাঁরা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। অতঃপর فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

অর্থাৎ তারা) আরামের উদ্যানে থাকবে। عَلَىٰ سُرُرٍ আয়াতে এর আরও বিবরণ

আসবে। মাঝখানে নৈকট্যশীলদের মধ্যে যে অনেক দল রয়েছে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে)। তাদের (নৈকট্যশীলদের) একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। [পূর্ববর্তী বলে আদম (আ) থেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত এবং পরবর্তী বলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তীদের মধ্যে বেশী সংখ্যক এবং পরবর্তীদের মধ্যে অল্প সংখ্যক হওয়ার কারণ এই যে, বিশেষ লোকদের সংখ্যা প্রতি যুগেই কম থাকে। হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সময় সুদীর্ঘ। উম্মতে মুহাম্মদীর আবির্ভাব কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে। কাজেই এ সময় কম। এমতাবস্থায় সুদীর্ঘ সময়ের বিশেষ লোকগণের তুলনায় কম সময়ের বিশেষ লোকগণের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কম হবে। কেননা, সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে লাখ, দু'লাখ তো পয়গম্বরই ছিলেন। শেষ নবীর সময়ে বা তার পরে অন্য কোন নবী নেই। তাই নৈকট্যশীলদের বিরাট দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্যে হবে কম সংখ্যক। অতঃপর নৈকট্যশীলদের প্রতিদানসমূহের বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ) তারা স্বর্ণখচিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে এবং

তাদের কাছে ঘোরাফিরা করবে চির-কিশোরেরা পানপাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। এটা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। তাদের জন্য থাকবে আনতনয়না হুরগণ। (তাদের গায়ের রঙ হবে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ) আবরণে রক্ষিত মোতির মত। তারা যা কিছু করত, এটা তার পুরস্কারস্বরূপ। তারা তথায় কোন অর্থহীন বাজে কথা শুনবে না (অর্থাৎ সুরা পান করার কারণে অথবা এমনিতেও আনন্দ বিমলিনকারী কোন কিছু থাকবে না)। শুধুমাত্র (চতুর্দিক থেকে) সালাম আর সালামের আওয়াজ আসবে। (অন্য আয়াতে আছে ঃ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ

এবং تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ এটা সম্মান ও সম্ভ্রমের দলীল। মোটকথা, আত্মিক ও দৈহিক সর্বপ্রকার আনন্দ ও বিলাসিতা থাকবে। এ পর্যন্ত নৈকট্যশীলদের পুরস্কার বর্ণিত হল। অতঃপর ডান পার্শ্বস্থ মু'মিনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যারা ডানদিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান! (মাঝখানে নৈকট্যশীলদের প্রতিদানসমূহ বর্ণিত হওয়ার কারণে এ বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করতে হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনদের প্রতিদানসমূহের বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ) তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি কলা, দীর্ঘ ছায়া, প্রবাহিত পানি এবং প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবার নয় (যেমন দুনিয়াতে মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়)। এবং নিষিদ্ধও নয় (যেমন দুনিয়াতে বাগানের মালিকরা নিষেধাজ্ঞা জারি করে)। আর থাকবে সমুন্নত শয্যা। (কেননা, এগুলো সমুন্নত স্তরে বিছানো থাকবে। এটা হবে বিলাস-ব্যসনের জায়গা। নারীর সঙ্গসুখ ব্যতীত বিলাস-ব্যসন পূর্ণ হয় না। এভাবে উপরোক্ত বিলাস-সামগ্রীর উল্লেখ দ্বারাই নারীর উপস্থিতিও জানা গেল। কাজেই অতঃপর اِنْشَاْنٰهُنَّ এর স্ত্রী-বাচক সর্বনাম দ্বারা জান্নাতী নারীদের আলোচনা করা হচ্ছে ঃ) আমি জান্নাতী রমণিগণকে (এতে জান্নাতের হুর এবং দুনিয়ার স্ত্রীগণ সবই শামিল রয়েছে; যেমন তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে যেসব রমণীকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, তারা সেসব রমণী, যারা দুনিয়াতে বৃদ্ধা অথবা কুৎসিত ছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে) বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি; অর্থাৎ তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, [অর্থাৎ সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে। 'দুররে-মনসূরে' আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-র হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত আছে] কামিনী, (অর্থাৎ তাদের উঠাবসা, চলার ধরন এবং রূপ-লাবণ্য সবকিছুই কামোদ্দীপক এবং তারা জান্নাতী-দের) সমবয়স্কা। এগুলো ডান দিকের লোকদের জন্য। (অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ডান দিকের লোকও বিভিন্ন প্রকার হবে; অর্থাৎ) তাদের এক বড় দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং এক দল পরবর্তীদের মধ্য থেকে; (বরং পরবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশী হবে। হাদীসে আছে যে, এই উম্মতের মু'মিনদের সমষ্টি পূর্ববর্তী সকল উম্মতের মু'মিনদের সমষ্টির চাইতে বেশী হবে। ডান দিকের লোকদের মর্যাদা যখন নৈকট্যশীলদের চাইতে

কম, তখন তাদের পুরস্কারও কম হবে। নৈকট্যশীলদের বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে এমন সব বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে, যেগুলো শহরবাসীরা পছন্দ করে এবং ডান দিকের লোকদের বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে এমন সব বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে, যেগুলো গ্রামবাসীরা পছন্দ করে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, উভয় দলের মধ্যকার পার্থক্য শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ। অতঃপর কাফির সম্প্রদায় ও তাদের শাস্তি বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যারা বাম দিকের লোক, কত না হতভাগা তারা! (এর বিবরণ এই যে) তারা থাকবে আগুনে, উত্তপ্ত পানিতে, ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। (অর্থাৎ এই ছায়ায় কোন দৈহিক ও আত্মিক উপকার থাকবে না। সূরা আর-রহমানে نحاس বলে এই ধূম্রকুঞ্জই বোঝানো হয়েছিল। অতঃপর শাস্তির কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তারা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল, (এর ফলে) তারা ঘোরতর পাপ কর্মে (অর্থাৎ কুফর ও শিরকে) ডুবে থাকত (অর্থাৎ ঈমান আনত না। অতঃপর তাদের কুফর বর্ণনা করা হচ্ছে, যা তাদের সত্যান্বেষণের পথে বড় বাধা ছিল)। তারা বলত ঃ আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলেও কতক কাফির কিয়ামত অস্বীকার করত, তাই এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ] আপনি বলে দিন ঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। অতঃপর (অর্থাৎ একত্রিত হওয়ার পর) হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যা-রোপকারিগণ! তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। এর উপর পান করবে ফুটন্ত পানি। তোমরা পান করবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়। (মোটকথা) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ওয়াক্বিয়ার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ঃ অন্তিম রোগশয্যায় আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন ঃ ইবনে কাসীর ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনী (রা) তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

ওসমান গনী---ما تشتكى আপনার অসুখটা কি?

ইবনে মসউদ---ذنوبى আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

ওসমান গনী---ما تشتهى আপনার বাসনা কি?

ইবনে মসউদ---رحمة ربى আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।

ওসমান গনী---আমি আপনার জন্য কোন চিকিৎসক ডাকব কি?

ইবনে মসউদ---امرضنى الطبيب চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

ওসমান গনী---আমি আপনার জন্য সরকারী বায়তুলমাল থেকে কোন উপঢৌকন পাঠিয়ে দেব কি?

ইবনে মসউদ---لا حاجة لى فيها এর কোন প্রয়োজন নেই।

ওসমান গনী---উপঢৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

ইবনে মসউদ---আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র্য ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করে। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করবে, সে কখনও উপবাস করবে না।

ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সনদ ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন।

اذا وقعت الواقعة---ইবনে কাসীর বলেন ঃ ওয়াক্বিয়া কিয়ামতের অন্যতম নাম। কেননা, এর বাস্তবতায় কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

ليس لوقعتها كاذبة---كاذبة শব্দটি عاقبة-এর ন্যায় একটি ধাতু। অর্থ এই যে, কিয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না।

خافضة رافعة---হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এই বাক্যের তফসীর এই যে, কিয়ামতের ঘটনা অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল জাতি ও ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে দেখা যায় যে, উপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় এবং নিঃস্ব ধনবান আর ধনবান নিঃস্ব হয়ে যায়।---(রূহুল মা'আনী)

হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে ঃ وكنتم ازواجا ثلثة

ইবনে কাসীর বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডান পার্শ্বে থাকবে। তারা আদম (আ)-এর ডান পার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী।

দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম (আ)-এর বাম পার্শ্ব

থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী।

তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আরশাধিপতির সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও ওলীগণ। তাঁদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ---ইমাম আহমদ (র) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা জান কি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র ছায়ার দিকে কারা অগ্রবর্তী হবে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ তারাই অগ্রবর্তী হবে, যাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে কবূল করে, যারা প্রাপ্য চাইলে পরিশোধ করে এবং অন্যের ব্যাপারে তাই ফয়সালা করে। যা নিজের ব্যাপারে করে।

মুজাহিদ বলেন ঃ سابقين তথা অগ্রবর্তিগণ বলে পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে সিরীন (রা)-এর মতে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ্---উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তারা অগ্রবর্তিগণ। হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী দল হবে। কারও কারও মতে যারা সবার আগে মসজিদে গমন করে, তারাই অগ্রবর্তী।

এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর বলেন ঃ এসব উক্তি স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, দুনিয়াতে যারা সৎ কাজে অন্যের চাইতে অগ্রে, পরকালেও তারা অগ্রবর্তীরূপে গণ্য হবে। কেননা, পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে দেওয়া হবে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ শব্দের অর্থ দল। যামাখশারীর মতে বড় দল।---(রূহুল মা'আনী)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে দু'জায়গায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে---নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জায়গায় ثُلَّةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মু'মিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে।

এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ দু'রকম উক্তি করেছেন। এক. হযরত আদম (আ)

থেকে শুরু করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী। মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জরীর (র) প্রমুখ এই তফসীর করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও তাই নেওয়া হয়েছে। হযরত জাবের (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এই তফসীরের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ যখন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সম্পর্কে প্রথম আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ

الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ নাযিল হল, তখন হযরত ওমর (রা) বিস্ময় সহকারে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)! পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্য-শীলদের সংখ্যা বেশী এবং আমাদের মধ্যে কম হবে কি? অতঃপর এক বছর পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়নি। এক বছর পরে যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ

مِّنَ الْآخِرِينَ নাযিল হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ

اسمع يا عمر ما قد انزل الله ثلة من الاولين و ثلة من الاخرين
الا وان من ادم الى ثلة و امتى ثلة -

শোন হে ওমর, আল্লাহ্ নাযিল করেছেন---পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল হবে। মনে রেখ, আদম (আ) থেকে শুরু করে আমা পর্যন্ত এক বড় দল এবং আমার উম্মত অপর বড় দল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীস থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ

مِّنَ الْآخِرِينَ আয়াতখানি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কিরাম ব্যথিত হন যে আমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় কম সংখ্যক হব। তখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ আয়াতখানি নাযিল হয়। তখন রসূলে করীম (সা) বললেনঃ আমি আশা করি যে, তোমরা (অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী) জান্নাতে সমগ্র উম্মতের

মুকাবিলায় এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেক হবে। বাকী অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু অংশ থাকবে---(ইবনে কাসীর)। এর ফলশ্রুতি এই যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসদ্বয়কে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা নির্ভেজাল নয়। কেননা, প্রথম আয়াত قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং দ্বিতীয় আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ তাদের বর্ণনায় নয়; বরং সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এর জওয়াবে 'রূহুল মা'আনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ প্রথম আয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত ওমর (রা) দুঃখিত হওয়ার কারণ এরূপ হতে পারে যে, তাঁরা মনে করেছেন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যে হার, সাধারণ মু'মিনদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। ফলে সমগ্র জান্নাতবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম হবে। কিন্তু পরের আয়াতে সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনা যখন ثُلَّةٌ (বড় দল) শব্দটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল, তখন তাঁদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তাঁরা বুঝলেন যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তবে অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। এর বিশেষ কারণ এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে পয়গম্বরই রয়েছেন বিপুল সংখ্যক। কাজেই তাঁদের মুকাবিলায় উম্মতে মুহাম্মদী কম হলেও সেটা দুঃখের বিষয় নয়।

দুই. তফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মতেরই দু'টি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে 'কুনে-উলা' তথা সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখদের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাঁদের পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমান সম্প্রাদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়ান, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি তফসীর গ্রন্থে এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রথম উক্তির সমর্থনে হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন যে, এর সনদ অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ হিসাবে তিনি কোরআন পাকের সেসব আয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মদী শ্রেষ্ঠতম উম্মত; যেমন كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ইত্যাদি আয়াত। তিনি আরও বলেছেন যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতে কম হবে---এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। তাই এ কথাই অধিক সঙ্গত যে, পূর্ববর্তিগণের অর্থ এই উম্মতের প্রথম যুগের মনীষিগণ এবং পরবর্তিগণের অর্থ তাঁদের পরবর্তী লোকগণ। তাদের মধ্যে নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে।

এর সমর্থনে ইবনে কাসীর হাসান বসরী (র)-এর উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

পূর্ববর্তিগণ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়া আল্লাহ্, আমাদেরকে সাধারণ মু'মিন তথা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তিগণের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

من مضى من هذه الامة অর্থাৎ পূর্ববর্তিগণ হচ্ছে এই উম্মতেরই পূর্ববর্তী লোকগণ।

এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রা) বলেন ঃ আলিমগণ বলেন এবং আশা রাখেন যে, এই উম্মতের মধ্য থেকেই পূর্ববর্তিগণ ও পরবর্তিগণ হোক।---(ইবনে কাসীর)

রূহুল মা'আনীতে দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থনে হযরত আবূ বকর (রা) এর রেওয়ায়েত-ক্রমে নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

عن ابى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله سبحانه ثلة من الاولين و ثلة من الاخرين قال هم جميعا من هذه الامة ـ

একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে---আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তির তফসীর প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেন ঃ তারা সবাই এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে।

এই তফসীর অনুযায়ী শুরুতে وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং প্রকারত্রয় উম্মতে মুহাম্মদী হবে।---(রূহুল-মা'আনী)

তফসীরে মাযহারীতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কোরআন পাক থেকে সুস্পষ্ট-রূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভিতরকার উচ্চস্তরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে---এটা সুদূরপরা-হত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, সেগুলো এই ঃ

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এবং كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

انتم تتمون سبعين امة انتم اخيرها و اكرمها على الله تعالى

---তোমরা সত্তরটি উম্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা

জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে---এতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি ? আমরা বললাম ঃ নিশ্চয় আমরা এতে সন্তুষ্ট। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ والذى نفسى بيده انى لارجوا ان تكونوا نصف اهل الجنة - যে সত্তার করায়ত্ত আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে।---(বুখারী, মাযহারী)

اهل الجنة مائة وعشرون صفا ثمانون منها من هذه الامة واربعون من سائر الامم -

জান্নাতীগণ মোট একশ' বিশ কাতারে থাকবে। তন্মধ্যে আশি কাতার এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে এবং অবশিষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উম্মত শরীক হবে।

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের জান্নাতীদের পরিমাণ কোথাও এক-চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ রেওয়ায়েতে দুই-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুমান মাত্র। অনুমান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ হয়েই থাকে।

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ----ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, موضونة-এর অর্থ স্বর্ণখচিত বস্ত্র।

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ----অর্থাৎ এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের মধ্যে বয়সের কোন তারতম্য দেখা দেবে না। হুরদের ন্যায় এই কিশোরগণও জান্নাতেই পয়দা হবে এবং তারা জান্নাতীদের খিদমতগার হবে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একজন জান্নাতীর কাছে হাজারো খাদিম থাকবে।---(মাযহারী)

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ---اكواب শব্দটি كوب-এর বহুবচন। অর্থ গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র। اباريق শব্দটি ابريق এর বহুবচন। এর অর্থ কুজা। كأس এর অর্থ সুরা পানের পিয়ালা। معين এর উদ্দেশ্য এই যে, এই একটি ঝরনা থেকে আনা হবে।

لَا يُصَدَّعُوْنَ---এটা صدع থেকে উদ্ভূত। অর্থ মাথাব্যথা। দুনিয়ার সুরা অধিক মাত্রায় পান করলে মাথাব্যথা ও মাথাঘোরা দেখা দেয়। জান্নাতের সুরা এই সুরার উপসর্গ থেকে পবিত্র হবে।

لَا يُنْزِفُوْنَ---نزف এর আসল অর্থ কূপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করা। এখানে অর্থ জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ---অর্থাৎ রুচিসম্মত পাখীর গোশ্ত। হাদীসে আছে, জান্নাতীগণ যখন যেভাবে পাখীর গোশ্ত খেতে চাইবে, তখন সেভাবে প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে।---(মাযহারী)

وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ---মু'মিন, মুত্তাকী ও ওলীগণই প্রকৃতপক্ষে 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডান পার্শ্বস্থ লোক। পাপী মুসলমানগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ---কেউ তো নিছক আল্লাহ্ তা'আলার কৃপায়, কেউ কোন নবী ও ওলীর সুপারিশের পর এবং কেউ আযাব ভোগ করবে, কিন্তু পাপ পরিমাণে আযাব ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে 'আসহাবুল ইয়ামীনের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, পাপী মু'মিনের জন্য জাহান্নামের অগ্নি প্রকৃতপক্ষে আযাব নয়, বরং আবর্জনা থেকে পবিত্র হওয়ার একটি কৌশল মাত্র। ---(মাযহারী)

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ---জান্নাতের অবদানসমূহ অসংখ্য, অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত। তন্মধ্যে কোরআন পাক মানুষের বোধগম্য ও পছন্দসই বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছে। আরবরা যেসব চিত্ত বিনোদন ও যেসব ফল-মূলকে পছন্দ করত, এখানে তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। سدر-এর অর্থ বদরিকা বৃক্ষ مخضود এর অর্থ যার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভারে বৃক্ষ নুয়ে পড়েছে। জান্নাতের বদরিকা দুনিয়ার বদরিকার ন্যায় হবে না; বরং এগুলো আকৃতিতে অনেক বড় এবং স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় হবে। طلح এর অর্থ কলা مضنود-এর অর্থ কাঁদি কাঁদি ظل ممدود এর অর্থ দীর্ঘ ছায়া। হাদীসে আছে---অশ্বে আরোহণ করে শত শত বছরেও তা অতিক্রম করা যাবে না। ماء مسكوب -এর অর্থ মাটির উপর প্রবাহিত পানি।

فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ---প্রচুর ফল; অর্থাৎ ফলের সংখ্যাও বেশী হবে এবং প্রকারও অনেক হবে। لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ---দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোন ফল গ্রীষ্মকালে হয় এবং মওসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোন ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে---কোন মওসুমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে কিন্তু জান্নাতের ফল ছিঁড়তে কোন বাধা থাকবে না।

وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ---فرش শব্দটি فراش এর বহুবচন। অর্থ বিছানা, ফরাশ। উচ্চ স্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জান্নাতের শয্যা সমুন্নত হবে। দ্বিতীয়ত এই বিছানা

মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয়ত স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারও কারও মতে এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। হাদীসে আছে الولد للفراش—পরবর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী নারীদের আলোচনাও এরই ইঙ্গিত---(মাযহারী) এই অর্থ অনুযায়ী مرفوعة এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত।

انا انشانا هن انشاء—انشاء শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। هن সর্বনাম দ্বারা জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে فراش-এর অর্থ জান্নাতে নারী হলে তার স্থলেই এই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শয্যা, বিছানা ইত্যাদি ভোগ-বিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জান্নাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জান্নাতী হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজনন ক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা বৃদ্ধা ছিল, জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী-যুবতী ও লাবণ্যময়ী করে দেওয়া হবে। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, শ্বেত কেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দর, ষোড়শী যুবতী করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহে আগমন করলেন! তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? আমি আরয করলামঃ সে আমার খালা সম্পর্ক হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রসচ্ছলে বললেনঃ لا تدخل الجنة عجوز—অর্থাৎ জান্নাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ণ হয়ে গেল! কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে কাঁদতে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন।---(মাযহারী)

اَبْكَارًا—এটা بكر-এর বহুবচন। অর্থ কুমারী বালিকা। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

عُرُبًا—এটা عروبة—এর বহুবচন। অর্থ স্বামী-সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী।

اَتْرَابًا—এটা ترب-এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। জান্নাতে পুরুষ ও নারী

সব এক বয়সের হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স তেত্রিশ বছর হবে।---(মাযহারী)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ শব্দের অর্থ এবং اولين ও اخرين-এর তফসীর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি اولين তথা পূর্ববর্তিগণ বলে হযরত আদম (আ) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত লোকগণ এবং اخرين তথা পরবর্তিগণ বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা মু'মিন-মুত্তাকিগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে। এমতাবস্থায় এটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কম গৌরবের বিষয় নয় যে, তারা পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ পয়গম্বরের উম্মতের সমান হয়ে যাবে; অথচ তাদের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। এছাড়া ثلة শব্দের মধ্যে এরূপ অবকাশও আছে যে, পরবর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যা পূর্ববর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী হবে।

পক্ষান্তরে যদি পূর্ববর্তিগণ এই উম্মতের মধ্য থেকেই হয়, তবে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মত শেষের দিকেও অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের থেকে বঞ্চিত থাকবে না; যদিও শেষ যুগে এরূপ লোকের সংখ্যা কম হবে। সাধারণ মু'মিন, মুত্তাকী ও ওলী তো এই উম্মতের শুরু ও শেষভাগে বিপুল সংখ্যক থাকবে এবং তাদের কোন যুগ 'আসহাবুল-ইয়ামীন' থেকে খালি থাকবে না। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতের একটি দল সদাসর্বদা সত্যের উপর কায়েম থাকবে। হাজারো বিরোধিতা ও বাধাবিপত্তির মধ্যেও তারা সৎ পথ প্রদর্শনের কাজ অব্যাহত রাখবে। কারও বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই দল স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবে।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ
تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝٦٥ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝٦٦
بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝٦٧ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ۝٦٨ ءَاَنْتُمْ
اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝٦٩ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا
فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝٧٠ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ۝٧١ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ
شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ۝٧٢ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا
لِّلْمُقْوِيْنَ ۝٧٣ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝٧٤

(৫৭) আমিই সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না? (৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে? (৫৯) তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই। (৬১) এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দিই, যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৪) তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট। (৬৬) বলবে ঃ আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম; (৬৭) বরং আমরা হাতসর্বস্ব হয়ে পড়লাম। (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৯) তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? (৭০) আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৭১) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৭২) তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? (৭৩) আমিই সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং মরুবাসীদের জন্য সামগ্রী। (৭৪) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তোমাদেরকে (প্রথমবার) সৃষ্টি করেছি (যা তোমরাও স্বীকার কর)। অতঃপর তোমরা (তওহীদকে ও কিয়ামতকে) সত্য বলে বিশ্বাস কর না কেন? (অতঃপর সৃষ্টির বিবরণ দিয়ে উপদেশ দান করা হচ্ছে ঃ) তোমরা যে (নারীদের গর্ভাশয়ে) বীর্যপাত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (বলা-বাহুল্য, আমিই সৃষ্টি করি)। আমি তোমাদের মৃত্যুর (নির্দিষ্ট) কাল নির্ধারিত করেছি।

(উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টিকে বিশেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখা আমারই কাজ। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমাদের বর্তমান আকার-আকৃতি বাকী রাখাও আমারই কাজ এবং) আমি এ ব্যাপারে অক্ষম নই যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতি দিই, যা তোমরা জান না। (উদাহরণত জন্তু জানোয়ারের আকৃতি দান করি, যা তোমরা ধারণাও করতে পার না। অতঃপর এর দলীল বলা হচ্ছে ঃ) তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হয়েছ (যে, তা আমারই কাজ)। তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (অনুধাবন করে এই অবদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তওহীদ স্বীকার কর এবং কিয়ামতে পুনরুজ্জীবনকে মেনে নাও)। তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি? (অর্থাৎ মাটিতে বীজ বপন করার মধ্যে তো তোমাদের কিছু হাত আছে; কিন্তু বীজকে অংকুরিত করা কার কাজ? অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন করা যেমন আমার কাজ; তেমনি ফসল দ্বারা উপকার লাভ করাও আমার কুদরতের উপর নির্ভরশীল)। আমি ইচ্ছা করলে তাকে (উৎপাদিত ফসলকে) খড়কুটা করে দিতে পারি (অর্থাৎ দানা মোটেই হবে না, গাছ শুকিয়ে খড়কুটা হয়ে যাবে)। অতঃপর তোমরা আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করবে যে, (এবার তো) আমরা ঋণের চাপে পড়ে গেলাম। বরং আমরা সম্পূর্ণ হাতসর্বস্ব হয়ে পড়লাম। (অর্থাৎ সমগ্র সম্পদই গেল। অতঃপর আরও হুঁশিয়ার করা হচ্ছে ঃ তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি? (এরপর এই পানিকে পানোপযোগী করা আমার অপর নিয়ামত)। আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না কেন? (তওহীদ বিশ্বাস ও কুফর বর্জনই বড় কৃতজ্ঞতা। অতঃপর আরও হুঁশিয়ার করা হচ্ছে ঃ) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তার বৃক্ষকে (যা থেকে অগ্নি নির্গত হয় এমনিভাবে যেসব উপায়ে অগ্নি সৃষ্টি হয় সেসব উপায়কে) তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? আমি তাকে (জাহান্নামের অগ্নির অথবা আমার কুদরতের) স্মরণিকা এবং মুসাফিরদের জন্য সামগ্রী করেছি। (স্মরণিকা একটি পারলৌকিক উপকার এবং অগ্নি দ্বারা রন্ধন করা একটি জাগতিক উপকার। 'মুসাফিরের জন্য' বলার কারণ এই যে, সফরে অগ্নি দুর্লভ হওয়ার কারণে একটি দরকারী সামগ্রী হয়ে থাকে) অতএব (যার এমন শক্তি) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাশরে মানুষের তিন প্রকার এবং তাদের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথভ্রষ্ট মানুষকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে, যারা মূলত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। অথবা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে অপরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। উদ্দেশ্য মানুষের সেই উদাসীনতা ও মূর্খতার মুখোস উন্মোচন করা, যে তাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত করে রেখেছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু বিদ্যমান আছে অথবা হচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে হবে,

এগুলোকে সৃষ্টি করা, স্থায়ী রাখা এবং মানুষের বিভিন্ন উপকারে নিয়োজিত করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের লীলা। যদি কারণাদির যবনিকা মাঝখানে না থাকে এবং মানুষ এসব বস্তুর সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে তবে সে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতকে পরীক্ষাগার করেছেন। তাই এখানে যা কিছু অস্তিত্ব ও বিকাশ লাভ করে সব কারণাদির অন্তরালে বিকাশ লাভ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও রহস্যের বলে কারণাদি ও ঘটনাবলীর মধ্যে এমন এক অটুট যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন যে, কারণ অস্তিত্ব লাভ করার সাথে সাথে ঘটনা অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ ও ঘটনা যেন একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যদর্শী মানুষ কারণাদির এই বেড়াজালে আটকে যায় এবং সৃষ্টকর্মকে কারণাদির সাথেই সম্বন্ধযুক্ত মনে করতে থাকে। যবনিকার অন্তরাল থেকে যে আসল শক্তি কারণ ও ঘটনাবলীকে সক্রিয় করে, তার দিকে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি যায় না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে খোদ মানব সৃষ্টির স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, এরপর মানবীয় প্রয়োজনাদি সৃষ্টির মুখোস উন্মোচিত করেছেন। মানুষকে সম্বোধন করে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক উত্তরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কেননা, প্রশ্নের মধ্যেই কারণাদির দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথম আয়াত একটি দাবী এবং পরবর্তী আয়াতগুলো এর স্বপক্ষে প্রমাণ। সর্বপ্রথম স্বয়ং মানব সৃষ্টি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। কারণ, গাফিল মানুষ প্রত্যহ দেখে যে, পুরুষ ও নারীর যৌন মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এরপর তা জননীর গর্ভাশয়ে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয় মাস পর একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কারণে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি এতই নিবদ্ধ থেকে যায় যে, পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক মিলনই মানব সৃষ্টির প্রকৃত কারণ। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ

---অর্থাৎ হে মানব! একটু ভেবে দেখ, সন্তান জন্মলাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতটুকুই তো যে, তুমি এক ফোঁটা বীর্য বিশেষ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কি যে, বীর্যের উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কি কি ভাবে এতে অস্থি ও রক্ত-মাংস সৃষ্টি হয়? এই ক্ষুদে জগতের অস্তিত্বের মধ্যে খাদ্য আহরণ করার, রক্ত তৈরী করার ও জীবাত্মা সৃষ্টি করার কেমন যন্ত্রপাতি কি কি ভাবে স্থাপন করা হয় এবং শ্রবণ, দর্শন, কথন, আস্বাদন ও অনুধাবন শক্তি নিহিত করা হয়, যার ফলে একটি মানুষের অস্তিত্ব একটি চলমান কারখানাতে পরিণত হয়? পিতাও কোন খবর রাখে না এবং যে জননীর উদরে এসব হচ্ছে, সেও কিছু জানে না। জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কোন বস্তু দুনিয়াতে থেকে থাকলে সে কেন বুঝে না যে, কোন স্রষ্টা ব্যতীত মানুষের অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় সত্তা আপনা-আপনি তৈরী হয়ে যায়নি। কে সেই স্রষ্টা? পিতা-মাতা তো জানেও না যে, কি তৈরী হল, কিভাবে হল? প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে

না মেয়ে? তবে কে সেই শক্তি, যে উদর, গর্ভাশয় ও ভ্রূণের উপরস্থ ঝিল্লি---এই তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এমন সুন্দর-সুশ্রী শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সত্তা তৈরী করে দিয়েছেন? এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ---(সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ্ মহান) বলে উঠে না, সে জ্ঞান-বুদ্ধির শত্রু।

এরপরের আয়াতসমূহে এ কথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব! তোমাদের জন্মগ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মঠ মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সকল কাজ-কারবারে তোমরা আমারই মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদের মৃত্যুরও একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোমাদের যে আয়ুষ্কাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বীরূপে পেয়ে থাক। এটাও তোমাদের বিভ্রান্তি বৈ নয়। আমি এই মুহূর্তেই তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোমাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে ধ্বংস না করে অন্য কোন জীবের কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবর্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পার। مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ এর সারমর্ম এই যে, কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি, اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের স্থলে তোমাদেরই মত অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারি وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ---এবং তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যেতে পার অথবা অন্য কোন জন্তুর আকারেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পার; যেমন বিগত উম্মতের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বানর ও শূকরে পরিণত হওয়ার আযাব এসে গেছে। তোমাদেরকে প্রস্তর ও জড় পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেওয়া যেতে পারে।

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ---খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানব সৃষ্টির গূঢ় তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছে ঃ তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অংকুর বের

করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব নেই যে, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অংকুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হিফাযতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরী করেছে বলে দাবীও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, মণের মণ মাটির স্তূপে পতিত বীজের মধ্য থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ কে তৈরী করল? জওয়াব এটাই যে, সেই পরম প্রভু, অপার শক্তিধর আল্লাহ্ তা'আলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক।

এরপর যে পানির অপর নাম জীবন এবং যে অগ্নি দ্বারা মানুষ রান্না-বান্না করে ও শিল্প-কারখানা পরিচালনা করে, সেগুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে একই ধরনের প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে সবগুলোর সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ - مقوين শব্দটি اقواء থেকে এবং اقواء শব্দটিকে قواء থেকে লওয়া হয়েছে। এর অর্থ মরু। কাজেই قوى শব্দের অর্থ হবে মরুবাসী। এখানে মুসাফির বোঝানো হয়েছে, যে প্রান্তরে অবস্থান করে খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় রত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আমারই শক্তি-সামর্থ্যের ফসল।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ - এর অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিভিত্তিক পরিণতি এই যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি ও তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালন-কর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। এটাই তাঁর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾
إِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهٗٓ إِلَّا
الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ
أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَآ
إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾

تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ
ٱلْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ
ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ
جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

(৭৫) অতএব আমি তারকারাজির অস্তাচলের কসম খাচ্ছি, (৭৬) নিশ্চয় এটা এক মহা কসম ---যদি তোমরা জানতে, (৭৭) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, (৭৮) যা আছে এক গোপন কিতাবে, (৭৯) যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। (৮০) এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (৮২) এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (৮৩) অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয় (৮৪) এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, (৮৫) তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না। (৮৬) যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (৮৭) তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৮৮) যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়; (৮৯) তবে তার জন্য আছে সুখ, উত্তম রিযিক এবং নিয়ামতে ভরা উদ্যান। (৯০) আর যদি সে ডান পার্শ্বস্থদের একজন হয়, (৯১) তবে তাকে বলা হবে: তোমার জন্য ডান পার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সালাম। (৯২) আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, (৯৩) তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা। (৯৪) এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে। (৯৫) এটা ধ্রুব সত্য। (৯৬) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের বাস্তবতা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে; কিন্তু তোমরা কোরআন মান না। অতএব) আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি। তোমরা যদি চিন্তা কর, তবে এটা এক মহা শপথ। (এ বিষয়ে শপথ করছি যে) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা এক সংরক্ষিত কিতাবে (অর্থাৎ 'লওহে-মাহ্ফুযে' পূর্ব থেকে) আছে। (লওহে-মাহ্ফুয এমন যে গোনাহ্ থেকে) পাক পবিত্র ফেরেশতাগণ ব্যতীত কেউ (অর্থাৎ কোন শয়তান ইত্যাদি) একে স্পর্শ করতে পারে না। (এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া তো দূরের কথা। সুতরাং কোরআন 'লওহে-মাহ্ফুয' থেকে দুনিয়া পর্যন্ত ফেরেশতাদের মাধ্যমেই আগমন করেছে। এটাই নবুওয়ত। শয়তান কোরআনকে আনতেই পারে না যে,

একে অতীন্দ্রিয়বাদ বলে সন্দেহ করা যাবে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ এবং وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ এতে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন) বিশ্ব-পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (كريم শব্দের ইঙ্গিতার্থ এটাই ছিল। এখানে নক্ষত্ররাজির অস্তমিত হওয়ার শপথ করার অর্থ ও উদ্দেশ্য তাই, যা সূরা নজমের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে বর্ণিত সব শপথই সার্থকরূপে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। ফলে সবগুলো শপথই মহান। কিন্তু কোন কোন স্থানে উদ্দেশ্যকে গুরুত্বদানের জন্য মহান হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টত উল্লেখও করা হয়েছে)। তবুও কি তোমরা এই কালামের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (অর্থাৎ একে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে জরুরী মনে করবে না?) তদুপরি একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (ফলে তোমরা তওহীদ এবং কিয়ামতকেও অস্বীকার করছ)। অতএব (এই অস্বীকৃত যদি সত্য হয়, তবে) যখন (মরণোন্মুখ ব্যক্তির) প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা (বসে বসে অসহায়-ভাবে) তাকাতে থাক, তখন আমি তার (অর্থাৎ মরণোন্মুখ ব্যক্তির) তোমাদের অপেক্ষা অধিক নিকটে থাকি (অর্থাৎ তার অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত থাকি। কেননা, তোমরা শুধু তার বাহ্যিক অবস্থা দেখ। আর আমি তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞাত থাকি। কিন্তু (আমার এই জ্ঞানগত নৈকট্যকে মূর্খতা ও কুফরের কারণে) তোমরা বুঝ না। অতএব যদি (বাস্তবে) তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (যেমন তোমরা মনে কর) তবে তোমরা এই আত্মাকে (দেহে) ফিরাও না কেন? (তোমরা তো তখন তা কামনাও কর) যদি তোমরা (কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করার ব্যাপারে) সত্যবাদী হও? (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যখন দেহে আত্মা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম নও তখন কিয়ামতে আত্মার পুনরুজ্জীবনকে রোধ করতে কিরূপে সক্ষম হবে? সুতরাং তোমা-দের অস্বীকৃতি অনর্থক। অতএব যখন প্রমাণিত হল যে, কিয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী, তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়) যে ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হবে (যাদের কথা পূর্বে وَالسَّابِقُونَ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে) তার জন্য আছে সুখ (স্বাচ্ছন্দ), খাদ্য এবং আরামের জান্নাত। আর যে ব্যক্তি ডান পার্শ্বস্থদের একজন হবে, (যাদের কথা وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) তাকে বলা হবেঃ তোমার জন্য (বিপদাপদ থেকে) শান্তি। কারণ, তুমি ডান পার্শ্বস্থদের একজন। (অনুকম্পা অথবা তওবার কারণে প্রথমেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে তাকে প্রথমেই এ কথা বলা হবে। পক্ষান্তরে শাস্তি-লাভের পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে একথা শেষে বলা হবে)। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারী-দের একজন হবে, তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা এবং সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) ধ্রুব সত্য। অতএব (যিনি এগুলো করেন) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি ও পার্থিব সৃষ্টির মাধ্যমে কিয়ামতে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ—قسم-এর শুরুতে অতিরিক্ত لا পদের ব্যবহার একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। যেমন বলা হয় لَا وَاللهِ মূর্খতা যুগের কসমে لا وا بيك সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ স্থলে لا সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমার ধারণা ঠিক নয়; বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্য। مواقع শব্দটি موقع এর বহুবচন। এর অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল অথবা অস্তের সময়। وَالنَّجْمِ এ আয়াতে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে, যেমন সূরা নজমেও إِذَا هَوَىٰ বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অস্ত যাওয়ার সময় দিগন্তে নক্ষত্রের কর্ম সমাপ্তি দৃষ্টিগোচর হয় এবং তার চিহ্নের অবসান প্রত্যক্ষ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষত্র চিরন্তন নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের মুখাপেক্ষী।

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ—যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করার উদ্দেশে পূর্ববর্তী আয়াতে শপথ করা হয়েছিল, এখান থেকে তাই বর্ণিত হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, কোরআন পাক সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা মিথ্যা যে, কোরআন কারও রচিত অথবা শয়তান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কালাম। নাউযুবিল্লাহ্।

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ—অর্থাৎ গোপন কিতাব। একথা বলে লওহে মাহ্ফুয বোঝানো হয়েছে। لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ—এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তফসীরবিদগণ এসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন। এক. ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ 'লওহে মাহ্ফুযের'ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং لَّا يَمَسُّهُ

এর সর্বনাম দ্বারা লওহে মাহ্‌ফুযই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন কিতাব অর্থাৎ লওহে মাহ্‌ফুযকে পাক-পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় مطهرون অর্থাৎ 'পাক-পবিত্র লোকগণ'—এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা 'লওহে মাহ্‌ফুয পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। এ ছাড়া مس শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেওয়া যায় না; বরং مس তথা স্পর্শ করার রূপক অর্থ নিতে হবে অর্থাৎ লওহে মাহ্‌ফুযে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা, লওহে মাহ্‌ফুযকে হাতে স্পর্শ করা ফেরেশতা প্রমুখ সৃষ্ট জীবের কাজ নয়।—(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই তফসীর করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, এ বাক্যটি إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ বাক্যে অবস্থিত 'সম্মানিত' শব্দটি কোরআনের বিশেষণ। এমতাবস্থায় لايمسه এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হবে। কোরআনের অর্থ হবে সেই কপি, যাতে কোরআন লিখিত আছে এবং مس শব্দটি হাতে স্পর্শ করার আসল অর্থে থাকবে। কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ আমি এই আয়াতের যত তফসীর শুনেছি, তন্মধ্যে এই তফসীরই উত্তম। এর মর্মও তাই, যা সূরা আবাসা-র নিম্নোক্ত আয়াত-সমূহের মর্ম ঃ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ

(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

এর সারমর্ম এই যে, আলোচ্য বাক্যটি كِتَابٍ مَكْنُونٍ-এর বিশেষণ নয়, বরং কোরআনের বিশেষণ।

দুই. দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, مُطَهَّرُونَ অর্থাৎ 'পাক-পবিত্র' কারা? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদের মতে এখানে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে, যাঁরা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। হযরত আনাস, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আব্বাস (রা) এই উক্তি করেছেন।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) ইমাম মালেক (র)-ও এই উক্তিই পছন্দ করেছেন।—(কুরতুবী)

কিছু সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন ঃ কোরআনের অর্থ কোরআনের লিখিত কপি এবং مطهرون এর অর্থ এমন লোক, যারা 'হদসে আসগর' ও 'হদসে আকবর' থেকে পবিত্র। বে-ওযূ অবস্থাকে 'হদসে আসগর' বলা হয়। ওযূ করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয ও নিফাসের অবস্থাকে 'হদসে আকবর' বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা জরুরী। এই তফসীর হযরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (র) থেকে বর্ণিত আছে।—(রূহুল মা'আনী)।

এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্রতা ব্যতীত কোরআনের কপি স্পর্শ করা জায়েয নয়। পবিত্রতার অর্থ হবে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, বে-ওযূ না হওয়া এবং বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরতুবী এই তফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি ভগ্নি ফাতেমাকে কোরআন পাঠরতা অবস্থায় পেয়ে কোরআনের পাতা দেখতে চান। ভগ্নী আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কোরআনের পাতা তাঁর হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করে পাতাগুলো হাতে নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত তফসীরের অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই তফসীরের সমর্থনে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রশ্নে হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবী মতভেদ করেছেন। তাই অনেক তফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কোরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রমাণ করার জন্য এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। হাদীসগুলো এই ঃ

হযরত আমর ইবনে হযমের নামে লিখিত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একখানি পত্র ইমাম-মালেক (র) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরূপও আছে ঃ لا يمس القران الا طاهر —অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তি যেন কোরআনকে স্পর্শ না করে।---(ইবনে কাসীর)

রূহুল মা'আনীতে এই রেওয়ায়েত মসনদে আবদুর রাযযাক, ইবনে আবী দাঊদ ও ইবনুল মুনযির থেকেও বর্ণিত আছে। তিবরানী ও ইবনে মরদুওয়াইহি বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا يمس القران الا طاهر ---(রূহুল মা'আনী)।

মাসআলা ঃ উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ উম্মত এবং ইমাম চতুষ্টয় এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত। এর খিলাফ করা গোনাহ্। পূর্ববর্ণিত সকল পবিত্রতাই এতে দাখিল আছে। হযরত আলী, ইবনে মসঊদ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, সায়ীদ ইবনে যায়দ, আতা, যুহরী, নাখয়ী, হাকাম, হাম্মাদ, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবূ হানীফা সবারই এই মাযহাব। উপরে যে মতভেদ বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল মাসআলার দলীলে, আসল মাসআলায় নয়। কেউ কেউ কোরআনের আয়াত এবং উল্লিখিত হাদীসের সমষ্টি দ্বারা এই মাসআলাটি সপ্রমাণ করেছেন এবং কেউ কেউ শুধু হাদীসকেই দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। সাহাবীদের মতভেদের কারণে তাঁরা আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

মাসআলা ঃ কোরআন পাকের যে গিলাফ মলাটের সাথে সেলাই করা, তাও ওযূ

ব্যতীত স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয। তবে আলাদা কাপড়ের গিলাফে কোরআন পাক বন্ধ থাকলে ওযূ ব্যতীত তাতে হাত লাগানো ইমাম আবূ হানীফার মতে জায়েয। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে তাও না-জায়েয।---(মাযহারী)

মাসআলা ঃ বে-ওযূ অবস্থায় পরিধেয় কাপড়ের আস্তিন অথবা আঁচল দ্বারা কোরআন পাক স্পর্শ করাও জায়েয নয়, রুমাল দ্বারা স্পর্শ করা যায়।

মাসআলা ঃ আলিমগণ বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থায় এবং হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় কোরআন পাক তিলাওয়াত করাও জায়েয নয়। গোসল করার পর জায়েয হবে। কারণ, কপিতে লিখিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হলে মুখে উচ্চারিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আরও বেশী ওয়াজিব হওয়া দরকার। কাজেই বে-ওযূ অবস্থায়ও তিলাওয়াত নাজায়েয হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস এবং মনসদে আহ্‌মদে বর্ণিত হযরত আলীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বে-ওযূ অবস্থায় তিলাওয়াত করেছেন। এ কারণে ফিকহ্‌বিদগণ এর অনুমতি দিয়েছেন।--(মাযহারী)

أَدْهَانٌ শব্দটি مُدْهِنُونَ --- أَفَبِهٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ

থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ তেল মালিশ করা। তেল মালিশ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটি কোরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ও পরে নক্ষত্ররাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছে। এক. কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম। এতে কোন শয়তান ও জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু সত্য। দুই. কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে নীত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার কাফিরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবী যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত্ত। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অপ-নোদনের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন মরণোন্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কণ্ঠাগত হয় তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে

তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক, তখন আমি জ্ঞান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে আমার করায়ত্ত—এ বিষয়টি চর্মচক্ষে দেখ না। সারকথা এই যে, তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আত্মার হিফাযত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা মনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে, আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে চলে গেছ, তবে এখানেই স্বীয় শক্তিমত্তা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতটুকুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতটুকু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক!

فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়ে কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি নৈকট্য-শীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ করবে। আর যদি 'আস-হাবুল ইয়ামীন' তথা সাধারণ মু'মিনদের একজন হয়, তবে সেও জান্নাতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি 'আসহাবে শিমাল' তথা কাফির ও মুশরিকদের একজন হয়, তবে জাহান্নামের অগ্নি ও উত্তপ্ত পানি দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ—অর্থাৎ উল্লিখিত প্রতিদান ও শাস্তি ধ্রুব সত্য। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ—সূরার উপসংহারে রসূলে করীম (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এতে নামাযের ভেতরের ও বাইরের সব তসবীহ্ দাখিল রয়েছে। খোদ নামাযকেও মাঝে মাঝে তসবীহ্ বলে ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্ব দানেরও আদেশ হয়ে যাবে।

سورة الحديد

সূরা হাদীদ

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○
هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○
هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ۭ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاۗءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۭ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۭ وَ
اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ
ۭ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর, প্রজ্ঞাময়। (২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৩) তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৪) তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই

থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৫) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু (সৃষ্ট বস্তু) আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে কিংবা অবস্থার মাধ্যমে)। তিনি শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন ও (তিনিই) মৃত্যু ঘটান। তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান। তিনিই (সব সৃষ্টের) আদি এবং তিনিই (সবার ধ্বংস হওয়ার পর) অন্ত। (অর্থাৎ তিনি পূর্বে কখনও অনস্তিত্বশীল ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কোনরূপে অনস্তিত্বশীল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই সবার শেষেও তিনিই)। তিনিই (স্বীয় অস্তিত্বে প্রমাণাদির আলোকে প্রকটভাবে) প্রকাশমান এবং তিনিই (সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে) অপ্রকাশমান। (অর্থাৎ কেউ তাঁর সত্তা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়। যদিও সৃজিতরা একদিক দিয়ে তাঁকে জানে এবং একদিক দিয়ে জানে না, কিন্তু তিনি সব সৃজিতকে সব দিক দিয়ে জানেন)। তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি (এমন সক্ষম যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে (অর্থাৎ ছয় দিন পরিমিত সময়ে) অতঃপর আরশে (যা সিংহাসন সদৃশ, এমনভাবে) সমাসীন (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর পক্ষে শোভনীয়)। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে (যেমন বৃষ্টি) ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় (যেমন উদ্ভিদ) এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয় (যেমন ফেরেশতারা। তাঁরা আকাশে উঠানামা করে ও বিধি-বিধান, যা অবতীর্ণ হয় এবং বান্দার আমল যা উত্থিত হয়। তিনি যেমন এসব বিষয় জানেন, তেমনি তোমাদের সব অবস্থাও তিনি জানেন। সেমতে) তিনি (জ্ঞাত হওয়ার দিক দিয়ে) তোমাদের সাথে থাকেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন? (অর্থাৎ তোমরা কোথাও তাঁর কাছ থেকে গোপন থাকতে পার না)। তোমরা যা কিছু কর, তিনি তা দেখেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সব বিষয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (অর্থাৎ কিয়ামতে পেশ হবে। এভাবে তওহীদের সাথে কিয়ামতও প্রমাণিত হয়ে গেল)। তিনিই রাত্রিকে (অর্থাৎ রাত্রির অংশকে) দিনে প্রবিষ্ট করেন, (ফলে দিন বড় হয়ে যায় এবং) তিনিই দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশকে) রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। (ফলে রাত্রি বড় হয়ে যায়। এই শক্তি-সামর্থ্যের সাথে তাঁর জ্ঞান এমন যে) তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ যে পাঁচটি সূরার শুরুতে سبح অথবা يسبح আছে, সেগুলোকে হাদীসে مسبحات তথা তসবীহযুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুম'আ এবং পঞ্চম তাগাবুন আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা

করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসীর বলেনঃ সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াতঃ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ হাদীদ, হাশর ও ছফে سَبَّحَ অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং জুমু'আ ও তাগাবুনে يُسَبِّحُ ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ ও যিকির অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়।---(মাযহারী)

শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও।---(ইবনে কাসীর)

এই আয়াতের তফসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই---সবগুলোরই অবকাশ আছে। 'আউয়াল' শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট; অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারো কারো মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমনঃ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। এক. যা কার্যত বিলীন হয়ে যায়; যেমন, কিয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। দুই. যা কার্যত বিলীন হয় না, কিন্তু সত্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোযখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভাল-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহ্র সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

ইমাম গাযালী (র) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার মারেফত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেফতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এসব স্তর আল্লাহ্র পথের বিভিন্ন মনযিল বৈ নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহ্র মারেফত।---(রূহুল-মা'আনী)

'যাহের' বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশ্য মান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাইতে অধিক কোন বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তি-সামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় কণায় দেদীপ্যমান।

স্বীয় সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা 'বাতেন' তথা অপ্রকাশমান। জ্ঞান-বুদ্ধি ও কল্পনা তাঁর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয়। কবি বলেনঃ

اے برتر از قیاس وگمان خیال ووهم -
وزهرچه دیده ایم وشنیده ایم وخوانده ایم
اے بـرون ازجمله قال وقیل من -
خاک بـرفـرق مـن وتـمـثیـل من ○

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাকনা কেন। এই 'সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত। কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্র ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র মানুষের সঙ্গে আছেন।

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ○ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۚ
وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ○
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ
دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ
الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ
قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

(৭) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ না, অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন? আল্লাহ্ তো পূর্বেই তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন---যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৯) তিনিই তাঁর দাসের প্রতি প্রকাশ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (১০) তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহ্-ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর,, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (১১) কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্কে উত্তম ধার দেবে, এরপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং (বিশ্বাস করে) যে ধন-সম্পদে তিনি তোমাদেরকে অপরের উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে (তাঁর পথে) ব্যয় কর। (এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই ধন-সম্পদ তোমাদের পূর্বে অন্যের হাতে ছিল এবং এমনিভাবে তোমাদের পর অপরের হাতে চলে যাবে। সুতরাং এটা যখন চিরস্থায়ী সম্পদ নয়, তখন একে প্রয়োজনীয় খাতেও ব্যয় না করে আগলে রাখা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি?) অতএব (এই আদেশ মুতাবিক) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং (বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না (এর মধ্যেই রসূলের প্রতি বিশ্বাসও দাখিল আছে)। অথচ (বিশ্বাস স্থাপন করার মজবুত কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তা এই যে)

রসূল (যার রিসালত প্রমাণিত) তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি (তাঁরই শিক্ষা মুতাবিক) বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন এবং (দ্বিতীয় কারণ এই যে) স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলে বিশ্বাস স্থাপন করার) অঙ্গীকার নিয়েছেন (এর মোটামুটি প্রতিক্রিয়া তোমাদের স্বভাবেও বিদ্যমান রয়েছে এবং রসূলের আনীত মো'জেযা এবং প্রমাণাদিও তোমাদেরকে এই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। অতএব) যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে চাও, (তবে এসব কারণ যথেষ্ট। নতুবা এছাড়া আর কি কারণের অপেক্ষা করছ? যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ অতঃপর এই বিষয়বস্তুর আরও ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে)।

(বিশেষ)বান্দা[মুহাম্মদ (সা)]-এর প্রতি প্রকাশ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, (যা তিনিই তার প্রাঞ্জলতা ও বিশেষ অলৌকিকতার কারণে উদ্দেশ্যকে সুন্দরভাবে বোঝায় যাতে (সেই বান্দা) তোমাদেরকে (কুফর ও মূর্খতার) অন্ধকার থেকে (ঈমান ও জ্ঞানের) আলোকে আনয়ন করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (তিনি এমন অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়নকারী তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ছিল। এখন ব্যয় না করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ঃ) তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, অথচ (এরও একটা মজবুত কারণ আছে। তা এই যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিশেষে আল্লাহ্রই থেকে যাবে (অর্থাৎ যখন সব মালিক মরে যাবে এবং তিনিই থেকে যাবেন। সুতরাং সব ধন-সম্পদ যখন একদিন ছাড়তেই হবে, তখন খুশীমনে দিলেই তো সওয়াবও হয়। কোন সৃষ্ট জীব নভোমণ্ডলের মালিক নয়, তবুও নভোমণ্ডল উল্লেখ করে সম্ভবত এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি যেমন নভোমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি, তেমনি ভূমণ্ডলও অবশেষে বাহ্যিকভাবে তাঁরই অধিকারে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে তো বর্তমানেও তাঁরই মালিকানাভুক্ত। مُسْتَخْلَفِينَ শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হল। অতঃপর ব্যয়কারীদের মর্যাদার তারতম্য বর্ণিত হচ্ছে। বিশ্বাস স্থাপন করে ব্যয় করা প্রত্যেকের জন্যই সওয়াবের কারণ, কিন্তু এর মধ্যেও তারতম্য আছে। তা এই যে) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে (এবং যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে) তারা (উভয়ই) সমান নয় ; (বরং) তারা মর্যাদায় তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যারা (মক্কা বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে প্রত্যেককেই আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণের (অর্থাৎ সওয়াবের) ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সব পরিজ্ঞাত

আছেন। (তাই উভয় সময়ের কর্মের জন্য সওয়াব দেবেন। অতএব যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করার সুযোগ পায়নি, আমি তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলি ঃ) কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে উত্তম (অর্থাৎ আন্তরিকতা সহকারে) ধার দেবে! এরপরও আল্লাহ্ একে (অর্থাৎ প্রদত্ত সওয়াবকে) তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং (বহুগুণে বৃদ্ধি করার পরও) তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। ('বহুগুণে' বলে পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং كريم বলে এর মানগত উৎকর্ষের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ——এর অর্থ আদিকালীন অঙ্গীকারও হতে পারে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে আগমনকারী সব আত্মাকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে তাদের একমাত্র পালনকর্তা এ কথার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কোরআন পাকে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى বলে এই অঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকারও হতে পারে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও তাঁদের উম্মতের কাছ থেকে শেষ নবী (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁকে সাহায্য করা সম্পর্কে নিয়েছিলেন। কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এই অঙ্গীকারের উল্লেখ আছে ঃ

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي - قَالُوا أَقْرَرْنَا - قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ——অর্থাৎ যদি তোমরা মু'মিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মু'মিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে 'তোমরা যদি মু'মিন হও' বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে?

জওয়াব এই যে, কাফির ও মুশরিকরাও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দাবী করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই ঃ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى

زُلْفَى اللّٰهِ ---অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের দাবী যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও কর্তব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে হতে পারে।

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ — مِيْرَاث অভিধানে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক ---মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে مِيْرَاث শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে সে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশত কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বতোভাবে আল্লাহ্রই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহ্র নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন আল্লাহ্র পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেনঃ একদিন আমরা একটি ছাগল যবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্য রাখলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ বন্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরয করলামঃ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেনঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহ্র পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহ্র কাছে তোমার জন্য থেকে যাবে। যে হাতটি নিজে খাওয়ার জন্য রেখেছ, পরকালে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে।---(মাযহারী)

আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেওয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পথে যা কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশত সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছেঃ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ---অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক. যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে, দুই. যারা মক্কা বিজয়ের পর মু'মিন হয়ে আল্লাহ্র পথে

ব্যয় করেছে। এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় এক শ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জিহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী।

মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্য ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এক. যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং দুই. যারা মক্কা বিজয়ের পর এ কাজে শরীক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশী।

মক্কা বিজয়কে উভয় শ্রেণীর মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি করার এক বড় রহস্য তো এই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের টিকে থাকা ও বিলীন হয়ে যাওয়া, ইসলামের প্রসার লাভ ও বিলোপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে একই রূপ ছিল। যারা হুঁশিয়ার ও চালাক, তারা এমন কোন দলে অথবা আন্দোলনে যোগদান করে না, যার পরাজিত হওয়ার অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা সামনে থাকে। তারা পরিণামের অপেক্ষায় থাকে। যখন সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখনই তারা তড়িঘড়ি তাতে যোগদান করে। কিছুসংখ্যক লোক আন্দোলনকে সত্য ও ন্যায়ানুগ বিশ্বাস করলেও বিপক্ষ দলের নির্যাতনের ভয়ে ও নিজেদের দুর্বলতার কারণে তাতে যোগদান করতে সাহসী হয় না। অপরপক্ষে যারা অসম সাহসী ও দৃঢ়চেতা, তারা কোন মতবাদ ও বিশ্বাসকে সত্য এবং বিশুদ্ধ মনে করলে জয় ও পরাজয় এবং দলের সংখ্যাল্পতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদের সামনে মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা, শক্তিহীনতা ও মুশরিকদের নির্যাতনের এক জাজ্বল্যমান ইতিহাস ছিল। বিশেষত ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করা জীবনের ঝুঁকি নেওয়া এবং বাস্তুভিটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর ছিল। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহায্য এবং ইসলামের সেবায় জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেছে তাদের ঈমানী শক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা চলে কি?

আস্তে আস্তে পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে মক্কা বিজিত হয়ে সমগ্র আরবের উপর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়। তখন কোরআন পাকের ভাষায় দলে দলে লোকজন এসে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে (يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا) কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত তাদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তাদেরকে কল্যাণ তথা ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে একথা বলে দিয়েছে যে, তাদের মর্যাদা পূর্ববর্তীদের সমান হতে পারে না। কারণ

তারা অসম সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তির কারণে বিরোধিতা ও নির্যাতন আশংকার উর্ধ্বে উঠে ইসলাম ঘোষণা করেছে এবং বিপদমুহূর্তে ইসলামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারকথা এই যে, সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তি পরিমাপ করার জন্য মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যবধান একটি মাপকাঠির মর্যাদা রাখে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই উভয় শ্রেণী সমান হতে পারে না।

সকল সাহাবীর জন্য মাগফিরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবশিষ্ট উম্মত থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى —অর্থাৎ পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত ও মাগফিরাতের ওয়াদা সবার জন্যই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে কিরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্য, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে কিরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র পথে কিছুই ব্যয় করেন নি এবং ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় অংশগ্রহণ করেন নি। তাই মাগফিরাত ও রহমতের এই কোরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে।

ইবনে হাযম (র) বলেন ঃ এর সাথে সূরা আম্বিয়ার অপর একটি আয়াতকে মিলাও, যাতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۝

অর্থাৎ যাদের জন্য আমি পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিয়েছি, তারা জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করবে। জাহান্নামের কষ্টদায়ক আওয়াজও তাদের কানে পৌঁছবে না। তারা পছন্দমত অবদানে চিরকাল বসবাস করবে।

আলোচ্য আয়াতে وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى বলা হয়েছে এবং সূরা আম্বিয়ার এই আয়াতে যাদের জন্য কল্যাণের ওয়াদা করা হয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, কোরআন পাক এই নিশ্চয়তা দেয়—পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ যদি সারা জীবনে কোন গোনাহ্ করেও ফেলেন, তবে তিনি তার উপর কায়েম থাকবেন না—তওবা করে নেবেন। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (স)-র সংসর্গ, সাহায্য, ধর্মের মহান সেবামূলক কার্যক্রম এবং তাঁর অসংখ্য পুণ্যের খাতিরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। গোনাহ্ মাফ হয়ে পূত-পবিত্র

হওয়া অথবা পার্থিব বিপদাপদ ও বেশীর বেশী কোন কষ্টের মাধ্যমে গোনাহের কাফফারা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটবে না।

কতক হাদীসে কোন কোন সাহাবীর মৃত্যুর পর আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আযাব পরকাল ও জাহান্নামের আযাব নয়; বরং বরযখ তথা কবর-জগতের আযাব। এটা অসম্ভব নয় যে, কোন সাহাবী কোন গোনাহ্ করে ঘটনাচক্রে তওবা ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর-জগতের আযাব দ্বারা পবিত্র করে নেওয়া হবে, যাতে পরকালের আযাব ভোগ করতে না হয়।

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা কোরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়—ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয়ঃ সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও উম্মতের মাঝখানে আল্লাহ্র তৈরী সেতু। তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষা পৌঁছার কোন পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাস গ্রন্থের সত্য-মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয়; বরং কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়।

তাঁদের দ্বারা কোন পদস্খলন বা ভ্রান্তিমূলক কোন কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তদ্দ্বারা তাঁরা একটি সওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোন গোনাহ্ হয়েই যায়, তবে প্রথমত তা তাঁদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মুকাবিলায় শূন্যের কোটায় থাকে। দ্বিতীয়ত তাঁরা ছিলেন অসাধারণ আল্লাহ্-ভীরু। সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবূল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দ্বারা গোনাহের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের মাগফিরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগফিরাতই নয়, رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি অনুযায়ী অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এবং ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল।

আজকাল ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা ও গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য বর্ণনার ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক লোক সাহাবায়ে কিরামকে দোষারোপের শিকারে পরিণত করছে। প্রথমত যেসব বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁরা এসব লিখছেন, সেগুলোর ভিত্তিই অত্যন্ত দুর্বল। যদি কোন পর্যায়ে তাদের